শতরূপা বোস রায়

মীর

এই পর্যন্ত

BanglaBook.org

"মীরকে মানুষ হিসেবে আমি শ্রদ্ধা করি। মীর একজন প্রবাদপ্রতিম অ্যাঙ্কর। মীর ইজ আ মিথ, ওকে এই জেনারেশনে কেউ চিনবে না হয়তো। ওর ক্ষমতা কতটা সেটা জানবে আগামী প্রজন্ম।"

রজতাভ দত্ত

"মীরকে জানতে পেরে, ওর সান্নিধ্যে এসে আমি পরম তৃপ্তি লাভ করি। মাঝে মাঝে মনে হয় ও যেন বিধাতার পক্ষপাতিত্বে সৃষ্টি হয়েছে। মীর ক্ষণজন্মা, সত্যি বিরল প্রতিভা।"

পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"মীর ভীষণ মডার্ন, কিন্তু তবুও ওর মধ্যে একটা সাবেকি ব্যাপার আছে এবং এই দুটোর সহাবস্থান একটা নতুন গন্ধ এনে দেয়, নিজের গন্ধ সৃষ্টি করে, আর সেটাই বোধ হয় সবাইকে সবার থেকে আলাদা করে রাখে। মীর সত্যি একজন আইকন।"

ঊর্মিমালা বসু

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জীবন যেমন
মীর এই পর্যন্ত
শতরূপা বোস রায়
প্রচ্ছদঃ পার্থপ্রতিম দাস
একটি সৃষ্টিসুখ প্রকাশ

১২৫ টাকা (ভারতীয় মুদ্রা)
৯.৯৯ আমেরিকান ডলার

ISBN 978-163415100-9

মীর

এই পর্যন্ত

শতরূপা বোস রায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

একটি সৃষ্টিসুখ প্রয়াস
www.sristisukh.com

Mir Ei Porjante

A Biographical Work by Satarupa Bose Roy

ISBN 978-1-63415-100-9

প্রথম সংস্করণঃ জানুয়ারি, ২০১৬

সৃষ্টিসুখ প্রকাশন এলএলপি-র পক্ষে হাল্যান, বাগনান, হাওড়া ৭১১৩১২

থেকে রোহণ কুদ্দুস কর্তৃক প্রকাশিত

© শতরূপা বোস রায়, ২০১৬

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদঃ পার্থপ্রতিম দাস

প্রচ্ছদ ফোটোগ্রাফঃ রানা বসু ঠাকুর

মূল্যঃ ১২৫ টাকা (ভারতীয় মুদ্রা) / ৯.৯৯ আমেরিকান ডলার

সৃষ্টিসুখ-এর বইয়ের আউটলেটঃ ৩০৫ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ (৭৮৯৯৭ ৪১৭৯৭)

মুদ্রকঃ সাইবার গ্রাফিক্স, ৩২/১ নৈনানপাড়া লেন, বরানগর, কলকাতা ৭০০০৩৬ (৯০৫১৪ ২৩০৭২)

বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ মেহদী হাসান খান, ওমিক্রন ল্যাব ও অভ্র কিবোর্ড ডেভালপমেন্ট টিম।

লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। আলোচনা বা সমালোচনার সুবিধার্থে বইটির কোনও বিশেষ অংশ উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাংলাকে ভালোবেসে বাংলা লেখা।

ইংরিজি লিখতে লিখতে হঠাৎ একদিন বাংলায় লিখতে বসা। এই বইটি তাদেরই জন্যে যাঁরা আমায় বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন —

বাবা মা দাদু ঠাম্মা দাউ আর দুয়া।

আমার সব কাজের সহায়ক তপোব্রত রায়

আর

তার জন্যে, যাকে আমি একটু একটু করে বাংলা বলতে শেখাচ্ছি, বাংলা অক্ষর পরিচয় করতে সাহায্য করছি —

আমার ৭ বছরের মেয়ে তনুস্কা।

ছবিতে মীর

মীর সম্পর্কে

মীর আফসার আলি, আমরা যাঁকে মীর নামে একডাকে চিনি, একজন রেডিও জকি, অনুষ্ঠান সঞ্চালক, টেলিভিশান হোস্ট, অভিনেতা এবং গায়ক। দীর্ঘ ২১ বছরের কর্মজীবনে ষোলো হাজার ঘণ্টারও বেশি রেডিওতে অনুষ্ঠান করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মীর এই মুহূর্তে বাংলা তথা পূর্ব ভারতের সম্ভবত সবথেকে জনপ্রিয় রেডিও জকি। সারা দেশ জুড়ে রেডিও মির্চির জন্যে তাঁর করা বিজ্ঞাপনী প্রচার জনসাধারণের হৃদয় জেতার পাশাপাশিই জিতে নিয়েছে বিজ্ঞাপন জগতের উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু পুরস্কার।

১৯৯৮-এ আঞ্চলিক টেলিভিশান চ্যানেলে শুরু হওয়া সংবাদ-অনুষ্ঠান 'খাস খবর'-এর মাধ্যমে মীর সংবাদ পাঠে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার অনুষ্ঠান এবং ইভেন্টে সঞ্চালকের ভূমিকায় দেখা যায় মীরকে। গত দু দশকে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে এই মুহূর্তে তিনি নিঃসন্দেহে এ দেশের অন্যতম সফল সঞ্চালক।

মীর 'ব্যান্ডেজ' নামক ব্যান্ডটির লিড ভোকালিস্ট।

নিজের অন্য সব কাজের পাশাপাশিই তিনি বিভিন্ন ক্লাসের মাধ্যমে রেডিও এবং টেলিভিশানে কাজ করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীদের 'প্রেজেন্টেশান স্কিল'-এর পাঠ দিয়ে থাকেন। এঁদের অনেকেই এখন জনপ্রিয় বাংলা চ্যানেলগুলিতে সংবাদ পাঠ এবং মডেলিং করছেন।

গত ন বছর ধরে জ়ি বাংলা চ্যানেলে মীর তাঁর নিজস্ব ঘরানার কমেডি পরিবেশন করে চলেছেন 'মীরাক্কেল' নামক শো-টিতে। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটির আটটি সিজন সম্প্রচারিত হয়েছে।

মীর অভিনীত চলচ্চিত্র

১। দ্য বং কানেকশান
২। চ্যাপলিন
৩। অভিশপ্ত নাইটি
৪। ভূতের ভবিষ্যৎ
৫। আশ্চর্য প্রদীপ
৬। শেষ অঙ্ক

About MIR

MIR AFSAR ALI aka just MIR is a radio jockey, emcee, television host, actor and singer. With over 16,000 hours (over a period of 21 years) of Radio programming experience, Mir is arguably the most popular FM Radio Jockey in Bengal and Eastern India. His nationwide radio campaigns for Radio Mirchi have not just won hearts all over India but also grabbed a number of prestigious advertising awards.

Mir raised the bar of Bengali news reading with the first private News program on regional TV, Khas Khabar, which started airing in 1998.

Mir has been an impresario for corporate shows and events of the nation's top business houses within and outside Bengal. Having compered over 3500 Live shows, he is undoubtedly one of the most prolific emcees in India over the last 21 years.

Mir is also the lead vocalist of a band called Bandage.

When he's not busy anchoring, he takes classes on Radio & TV presentation skills for aspiring youngsters, many of whom have gone on to become News anchors or models on popular Bengali channels.

Mir has also been presenting his own brand of comedy on a show called MIRAKKEL on Zee Bangla for the last 9 years. It has completed 8 seasons.

Movies by Mir

1. The Bong Connection
2. Chaplin
3. Obhisopto Nighty
4. Bhuter Bhobiswot
5. Aschorjyo Prodip
6. Sesh Anka

মীর এই পর্যন্ত

আব্বা আর মা-র সঙ্গে
তখন, এখন

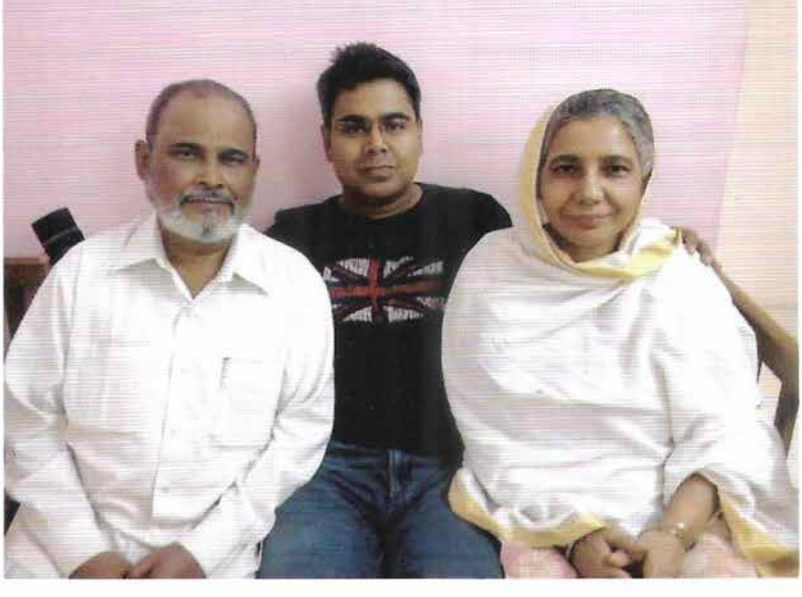

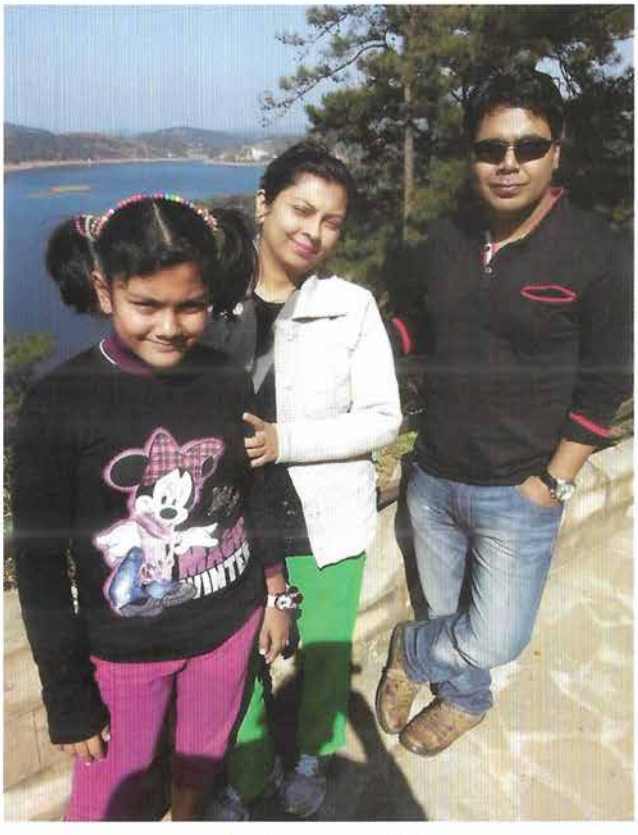

পারিবারিক বেষ্টনীতে

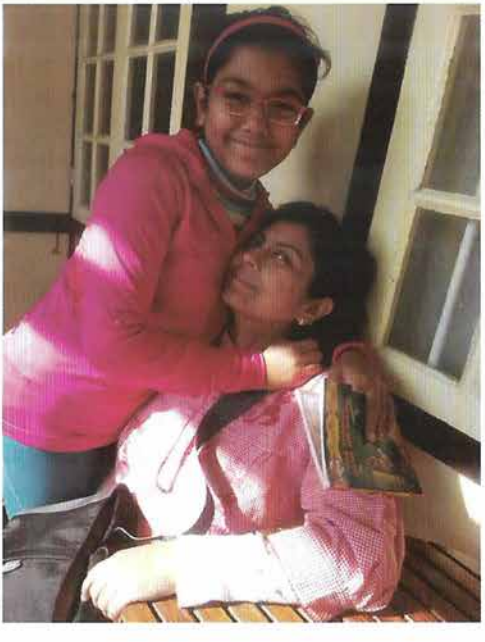

স্ত্রী ডক্টর সোমা ভট্টাচার্য
এবং কন্যা মুসকান

ব্যান্ডেজ

মাস্টার এবং মায়েস্ত্রো

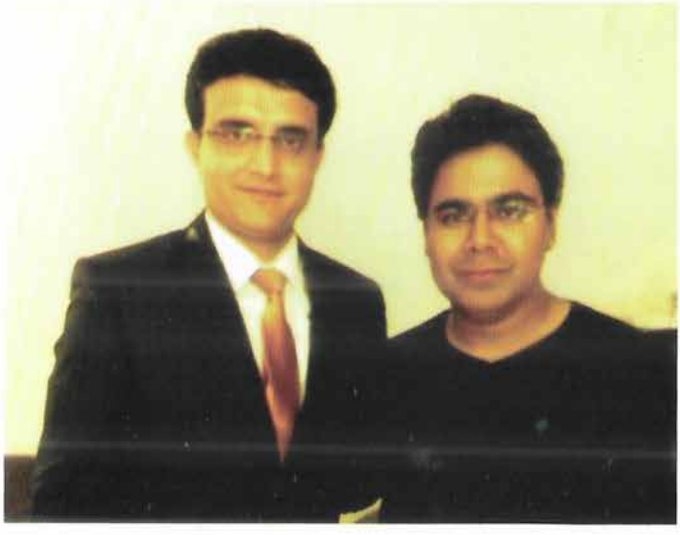

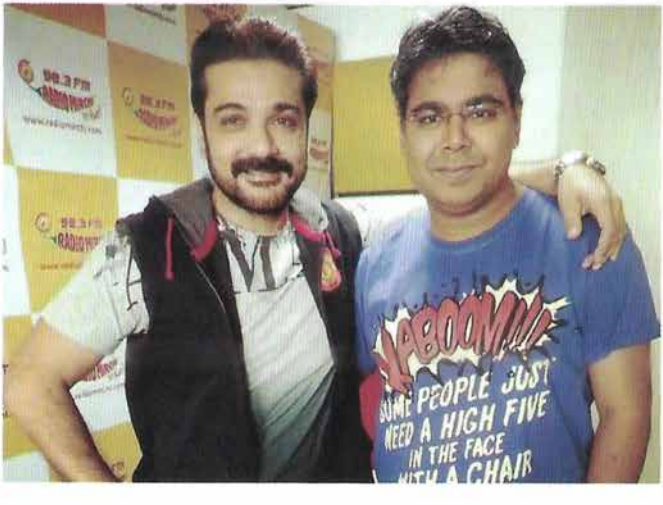
98.3 FM
SOME PEOPLE JUST
NEED A HIGH FIVE
IN THE FACE

অনেক তারার মাঝে

অনেক তারার মাঝে

নানা বেশে নানা ভাবে

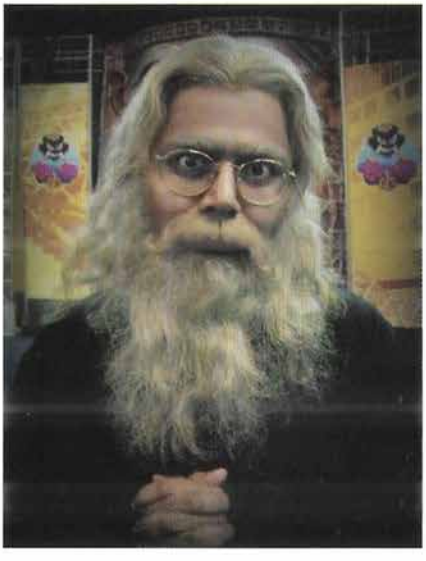

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এক

মীরের সম্পর্কে এমন একটি বই লেখার ভাবনা মাথায় এসেছিল যখন ওকে নিয়ে আট কলামের একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম কলকাতার একটা নাম করা ইংরেজি সংবাদপত্রে। সে অনেকদিন আগের কথা। তার পরেই আমি আমার শহর থেকে দূরে, কলকাতার সাংবাদিক জীবনটাকে পুরোনো খবরের কাগজের মতোই আমার শহরের ব্যস্ততার ভাঁজে গুঁজে দিয়ে পাড়ি দিয়েছিলাম সুদূর এই বিদেশে। এখানে এসে অবধি অসম্ভব কর্মব্যস্ত একটা জীবন খানিকটা নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আমায় বেঁধে ফেলল চতুর্দিক থেকে। এ এমন একটি কঠিন গ্রন্থি যে এর থেকে মুক্তি খুব সহজে পাওয়া যায় না। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য বাসনা, স্বপ্নপূরণের আশা আর সব থেকে ভয়ানক আরও পাবার আকাঙ্ক্ষা। সেই ঘোড়দৌড়ে পুরোনো ইচ্ছে, ভাবনা, ভালোলাগা — সব কিছু যেন কোথায় হারিয়ে গেল নিমেষে। আমার এই পৃথিবীর এই প্রান্তে বৃষ্টি পড়ে বারোমাস। দেখা যায় না দীপ্ত সূর্যের হীরের দ্যুতির মতো প্রখর সাদা রং, দেখা যায় না অস্তগামী রঙিন আলো। এখানে মন খারাপের মেঘগুলো ভিড় করে যখন তখন। ধূসর সূর্যের নিভে যাওয়া আলোয় এমনি করে মাঝে মাঝেই আমার ভেজা মনের ঠিকানা হাতড়ে বেড়াই। সেদিন ঠিক তেমন হল। একটা ছেঁড়া খাতার হলদে হয়ে যাওয়া কয়েকটা পাতা হঠাৎই ড্রয়ারে জড়ো করা কাগজের মধ্যে থেকে উঁকি দিয়ে আমার নজর কাড়ল। টেনে বের করে দেখলাম বেশ পুরোনো হাতে লেখা একটা ইন্টারভিউ-এর কিছু অংশ সেটি। বছর পাঁচেক আগের কিংবা তার থেকে একটু বেশিই পুরোনো হবে। কালি কোথাও কোথাও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। সবটা পড়ে উদ্ধার করাটা দুরূহ কাজ বলে মনে হল। তবুও পাতাগুলো পিছু ছাড়ল না। পুরোনো পাতার গন্ধে হঠাৎ যেন আমার চেনা শহরের রাস্তার পোড়া ডিজেলের গন্ধটা নাকে এল। অদ্ভুত ব্যাপার, অসম্মানভরে ট্র্যাশ বলে ফেলেও দিতে পারলাম না পেপার বিনে। অনেক চেষ্টার পরে যেটা উদ্ধার করলাম, সেটা কয়েকটা তারিখ ছাড়া আর কিছুই না। কলকাতায় সাংবাদিকতা করার সময় এমন অনেক ইন্টারভিউ করে রাখতাম যা হয়তো সব সময় পাবলিশ করার সুযোগ পেতাম না। ছেঁড়া পাতার সেই তারিখটা আর্টিকেলের তারিখের সঙ্গে মিলে গেল। বুঝলাম এইটা মীরকে নিয়ে লেখা একটা ইন্টারভিউ-এর কিছু অংশ। ২০০৬ সালে ওই ইংরিজি খবরের কাগজে বেরিয়েছিল।

BanglaBook.org

সেদিন আমার হারানো ইচ্ছেগুলো হুড়মুড়িয়ে আমার সামনে এসে ভিড় করল। আমার ছেঁড়া খাতার জীর্ণ পাতাগুলো উলটিয়ে আরেকবার এসে দাঁড়ালাম আমার শহরের মুখোমুখি। চোখ বন্ধ করে যেন শুনতে পেলাম আমার শহরের হৃদস্পন্দন। পুরোনো খাতার অক্ষরগুলোর মধ্যে স্পর্শ করলাম আমার হারিয়ে যাওয়া ধুলোপড়া সাংবাদিক সত্তাটাকে। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা, বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস। যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম আরও একবার নিজেকে। বইটা আমায় লিখতেই হবে। আবার আরেকবার শহরের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে। সেই পুরোনো ফোন-বইয়ের পাতা উলটিয়ে নাম্বার ডায়াল করে বেশ ভয়ে ভয়ে নিজের পরিচয় দিলাম মীরকে। "পারবে সময় দিতে? অনেকদিনের ইচ্ছাপূরণ হয় তাহলে।" এতদিন পরে, প্রায় সাত বছর তো হবেই, একবারে গলা শুনে চিনতে পেরে মীর আবার প্রমাণ করে দিল যে, সে এই ভাবেই সবার থেকে আলাদা। তার স্বভাবজাত হালকা সুরে বলেই ফেলল, "সময়? এই জিনিসটারই বড্ড অভাব। আমার এমন ব্যস্ততা যে, কখন কীভাবে সময় দিতে পারব নিজেই জানি না। রেডিও আর টেলিভিশান একসঙ্গে বজায় রাখতে গিয়ে আমার বাবা-মা আমায় কেমন দেখতে প্রায় ভুলতে বসেছেন। ভোর হলে রেডিওতে গলা শুনতে পান আর সন্ধ্যে নামলে টিভির পর্দায় রং মেখে পাগলামি করতে দেখেন। আমার সব চুল পেকে গেছে, তার জন্য দায়ী একমাত্র সময় আর তার থেকেও বড় কথা সময় দিতে পারি না বলে, আমার সবকটা গার্লফ্রেন্ড ভেগে গেছে। তাই ভাবছি কী করব?"

বাড়িতে থাকার সবকটা ঘণ্টা একসঙ্গে করলে সেটা বোধ হয় পাঁচ কি ছ ঘণ্টা হবে। শুধু রাত্রে ঘুমোতে আসা, কখনও চাপ থাকলে ঘুমের সঙ্গেও আপোষ করা আছে — তাকেও সযত্নে পরের দিনের সেডিউলে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যেতেই পারে। তবুও এই বইয়ের জন্য মীর আমায় যেমন করে আর যতটা সময় দিয়েছে তার জন্য তাকে অনেক ধন্যবাদ। কখনও ব্ল্যাকবেরি, কখনও স্কাইপ, কখনও ইন্টারন্যাশনাল ফোন কল, আবার কখনও ওয়াটসএ্যাপ। একটা করে প্রশ্ন মাথায় এসেছে অমনি টাইপ করে পাঠিয়ে দিয়েছি। উত্তরের অপেক্ষায় দুদিন, তিনদিন কেটে গেছে। তারপর একদিন হুড়মুড় করে সব তথ্য এসে পৌঁছেছে। সেবার কলকাতা গিয়েও টুকরো টুকরো কয়েকটা সাক্ষাতে অনেক তথ্য জোগাড় করে এনেছি। ভাবতেই পারছি না যে, সব রকম ব্যস্ততা কাটিয়েও বইটা শেষ অবধি লিখতে পারছি।

BanglaBook.org

অসম্ভব ব্যস্ত একটা জীবন মীরের। সে সত্যি আমার ছেঁড়া খাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই আর। বছর কয়েক আগেও এতটা খ্যাতির শীর্ষে তাকে দেখা যায়নি। কিন্তু তার মধ্যে যে শীর্ষে থাকার অদম্য জেদ ছিল, সেটা বারবার তার চেহারায়, তার ভঙ্গীতে, ভাষায়, ভাবনায়, সাধনায় ধরা দিয়েছে। সেই অল্প বয়সের চোখ দিয়ে দেখা মানুষটিকে সেই সময় স্যালুট করে বলেছিলাম, "ইউ উইল উইন দ্য রেস।" নিজের দূরদর্শিতা প্রমাণ হওয়ায় মেঘে ঢাকা সন্ধ্যায় হঠাৎ মনের মধ্যে একটা ভালোলাগার সঞ্চার হল। চরম দুঃখের মধ্যেও মীরের উপস্থিতি মানুষকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। তার হাসির রেশ শুনেছি শিশুর রোগশয্যায় ওষুধের মতো কাজ করে। আজ ভাবতে ভালো লাগছে আমার শহর যাকে এমন করে আলিঙ্গন করে কাছে টেনে নিয়েছে, যার হাসির জোয়ারে কলকাতার মানুষ ভেসে বেড়াচ্ছে, সেই অতি চেনা মানুষটির প্রথম জীবনের কিছু না বলা কথা, কিছু গ্লানি, কিছু কঠিন সত্যি আমার তহবিলে সংরক্ষিত। ভাবতে ভালো লাগছে সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় মীর একটুও পালটায়নি। আমার ধুলো জমা কাগজের থেকে বেরিয়ে সে তৈরি করেছে তার একটা প্রতিষ্ঠার জগৎ, একটা বিশাল ফ্যান ফলোয়িং। তার খ্যাতি এখন নতুন কাগজের গন্ধে, টিভির প্রাইম টাইমে, সকল কলকাতাবাসীর চায়ের আড্ডায়। রুপোলি পর্দার দৌলতে তার জয়গান এখন লোকের মুখে মুখে ফেরে। অথচ তার সঙ্গে অনায়াসে ভাগ করে নেওয়া যায় পথচলতি মানুষের কঠিন রোজনামচা।

নেদারল্যান্ডস্ থেকে ফোন করে বললাম, "তোমায় নিয়ে বই লিখতে চাই। কয়েকটা পুরোনো ইন্টারভিউ আমার অনেকদিনের ইচ্ছেটাকে ট্রিগার করেছে।" মীর হেসে বলে উঠল, "সাইউন্ডস কুল, কিন্তু আমি কেন? এতজন থাকতে হঠাৎ আমি কেন?" প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়া খুব সহজ ছিল না সেদিন। উলটে আমি সেই সময় নিজেকে প্রশ্ন করলাম, "সত্যি তো! কলকাতা শহরে হাজার হাজার সেলিব্রিটির থেকে মীর আফসার আলি কতটাই বা আলাদা যে তাকে নিয়ে একটা গোটা বই লেখা যায়? পরে ভাবলাম বইটি কি সত্যি মীরের জন্য লেখা? যখন ওর মুখ থেকে ওর দৈনন্দিন জীবনের সংঘর্ষের কথা শুনেছিলাম, সেদিন মনের মধ্যে ভয়ানক একটা আলোড়ন উঠেছিল। কখনও ভয়ে বুক কেঁপে উঠেছে, কখনও কান্নায় বুক ভেঙে গেছে, আবার কখনও সার্থকতার আনন্দে, জয়ের আনন্দে মনের সব ভার দূর হয়েছে নিমেষে। তখনই মীরের প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। এই বই ঠিক ওকে নিয়ে বা ওর জন্য লেখা নয়। এই সেলিব্রিটির জীবনের সেলিব্রেশনের কথা শুধু তার জীবনের বায়োগ্রাফি হবে না, এই জীবনের কথায় বাজবে বেঁচে থাকার জয়গান। পার্ক

BanglaBook.org

সার্কাসের গলি থেকে জ়ি বাংলার স্টেজ অবধি পৌঁছনোর জার্নিটা যে খুব সহজ ছিল না, সেটা মীর তার জীবনের প্রত্যেক প্রহরে বার বার নতুন করে আবিষ্কার করেছে। সেই কঠিন পথে একা এতদূর অবলীলায় এগিয়ে আসতে পেরেছে বলে মীর আজ সকল স্তরের মানুষকে আলিঙ্গন করতে পারে, অনস্ক্রিন সব মানুষের দুঃখে কেঁদে উঠতে পারে অনায়াসে। আবার বাস্তবের কঠিন টানাপোড়েনে জর্জরিত মানুষের মুখে আনতে পারে হাসির জোয়ার। এই বই শুধু তারই জন্য লেখা নয়। এটি সেই মানুষগুলোর জন্য, যারা এখনও জীবনের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে যুদ্ধটা চালিয়ে যাচ্ছে। মীরের জীবনের কথা হয়তো কোথাও কোথাও তাদেরও আলোর সন্ধান দেবে, দেবে বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা।

যে কোনও শিল্পীর জীবনে এটি একটি খুব প্রিয় শব্দ — স্ট্রাগল পিরিয়ড। এই সময়টাতেই সাধারণ থেকে অসাধারণ হবার লড়াইটা প্রবল হয়। মীরের জীবনের এই 'স্ট্রাগল পিরিয়ড'টা ঠিক কখন এসেছিল আর ঠিক কীভাবে ওকে অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছে, সেই গল্পের মধ্যেই মীরকে খুঁজে পাওয়া যায়। সবাইকে হাসানোর ম্যাজিকটা ঠিক কীভাবে করায়ত্ত করেছে মীর, এই বই তারই প্রমাণ। এটি মুখ গুঁজে কান্নার গল্প, অজস্র গুণমুগ্ধের ভিড়ে হঠাৎ একা হয়ে যাবার গল্প, অনেক অপমানের কথা, সেই সঙ্গে আবার আপামর কলকাতাবাসীর তথা দর্শকদের ভালোবাসার কথা। মীরের সঙ্গে অন্য এক মীরের মুখোমুখি হবার কথা। তার প্রাত্যহিক জীবনের সংঘর্ষের কথা।

মূল তথ্যে প্রবেশ করবার আগে এই বই লেখা নিয়ে যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগেছি সেই কথা না বললে হয়তো বা এই বই সামগ্রিকভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মীরের জীবনখাতার প্রত্যেকটি শব্দের ধার বুকে বাজার আগে যে প্রচণ্ড রকমের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমায় প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে, সেটা বোধ হয় সবার জানা দরকার আমি নিজে মীরের গুণমুগ্ধ হলেও আমার আশেপাশে এমন অনেককে খুঁজে পেয়েছিলাম, যারা মীরকে নিয়ে এই বই লেখার কথা শুনে আমায় বলেছিল, "তুমি লিখবে মীরকে নিয়ে বই? ইটস নট ইয়োর জঁর!" অবাক হয়ে আমার সেই সাংবাদিক বন্ধুকে বলেছিলাম, "কেন লিখতে পারব না বলছ?" আপত্তির সুরে আমার বন্ধুটি বলে উঠেছিল, "আসলে মেনস্ট্রিম সাহিত্যে মীরের জায়গাটা কোথায় সেটা আমি ঠিক বুঝি না। বই তো যে কাউকে নিয়েই লেখা যায়, কিন্তু তার সাহিত্যগত মূল্য কতখানি, সেটাও বিচার করা জরুরি।" বলতে দেবার সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমার বন্ধু আরও বলে উঠল, "মীরের মধ্যে একটা সহজাত ম্যাজিক

BanglaBook.org

আছে। কোনও সন্দেহ নেই ওর মধ্যে অনেক প্রতিভা। উপস্থিত বুদ্ধি আর উইট মিলিয়ে ও যে ধরনের হিউমার ক্রিয়েট করে, তা কলকাতার লোকের কাছে একদম ভিন্ন স্বাদের। কিন্তু এটাও অস্বীকার করতে পারো না যে, সে মাঝে মাঝেই সহবত আর ভদ্রতার গণ্ডি পেরিয়ে লোকের সামনে এমন কিছু আপত্তিজনক উক্তি করে থাকে, যা একজন রেস্পন্সিবল মানুষ হিসেবে তার থেকে কাম্য না।" তর্কটা জমে উঠেছিল। মনে মনে নিজেকে তৈরি করেছিলাম এরকম অনেক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা থাকলেও বইটি প্রকাশ হবার আগেই যে সেগুলোর সম্মুখীন হতে হবে এটা সত্যি ভাবিনি। খানিকটা বিরক্তির সুর গলায় এনে বললাম, "মেনস্ট্রিম সাহিত্যে তোমরা কাদের অন্তর্ভুক্ত করো? সাহিত্যের কথা উঠলেই বাঙালি যে কেন এখনও রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরৎ, সুনীল এদের বাইরে বেরোতে পারে না বুঝি না। মীর অন ক্যামেরা রবি ঠাকুরের গানের প্যারোডি করেছে, ব্যঙ্গ করেছে বলে কি তোমার মনে হয় ওকে মেনস্ট্রিম সাহিত্যে ঢোকার অধিকার দেওয়া যায় না?" আমার বন্ধু এবারে একটু বিরক্তির সুরে বলে উঠল, "মীর বড় উদ্ধত। ও কাউকে মানে না।" উত্তেজনার পারা এবারে আমারও বাড়তে লাগল। বিরক্তির সুরে আমিও বলে উঠলাম, "উদ্ধত হতে হলে সাহসীও হতে হয়। আমি চিরকাল ওর সাহসটাকেই বড় করে দেখেছি, ওর ঔদ্ধত্যটাকে নয়। আর আমার বিচারে সেটা খুব পজিটিভ একটা দিক। যদি নিজের ওপরে কনফিডেন্স থাকে অন্যকে মানার দরকারটাই বা কি?"

তর্কটা সেদিনের মতো তুলে রেখেছিলাম। হয়তো খানিকটা শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেই। কিন্তু জেদটা সেদিন যেন আরও টগবগিয়ে উঠেছিল। এইখানে বলে রাখা ভালো যে মীরকে আলাদা করে প্রতিষ্ঠা বা ওর হয়ে সমাজকে কিছু বলার জন্য এই বই আমি লিখতে বসিনি। ধরা যেতেই পারে, এটি একজন সাধারণ মানুষের লড়াইয়ের কথা। যদিও লড়াইটা কোনওদিনই ওর একার ছিল না। বরং ছিল ওর সমগ্র পরিবারের। লড়াইয়ের রং, রূপ-গন্ধ-চেহারা সবটা পালটে গেছে। পালটায়নি শুধু 'লড়াই' শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থটা। এই বই মীরকে নতুন করে সমাজে কোনও জায়গা দেবে না। সেই জায়গাটা মীর নিজেই তার ক্ষমতা, তার প্রতিভার জোরে গড়ে তুলেছে তিলে তিলে। আমি শুধু একজন লেখক হিসেবে মীরকে সম্মান ভরে এটি উপহার দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, যে কঠিন পরিশ্রম সে দিনরাত করে চলেছে, সেই শ্রমের বিনিময়ে এইটুকু সম্মান তার প্রাপ্য।

BanglaBook.org

বইটি একটা বায়োগ্রাফি বা ইন্টারভিউ-এর চিরাচরিত নিয়ম মেনে লেখা নয়। বাধ্যতামূলক কোনও সময়ক্রমও অনুসরণ করা হয়নি, সেটা খানিকটা ইচ্ছাকৃতই। যেহেতু এই বইয়ের বেশিরভাগ তথ্যই বিদেশে বসে, অনলাইন ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা, তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই আমি মীরের বাবা এবং মায়ের সঙ্গে, বা ওর অন্য আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি।

বইটি শুরু মীরের বাবার কথা দিয়ে। ওর মুখ থেকে যখন মীরের আব্বা অর্থাৎ মীর সুলতান আহমেদের কথা শুনেছি, তখন মনে হয়েছে মীর হয়তো কোনও উপন্যাসের কোনও এক স্বপ্নিল চরিত্রের দুঃসাহসিক চরিত্রের বর্ণনা দিচ্ছে। ওর মুখ থেকে পুরোটা শোনার পরে বেশ কয়েকদিন সময় লেগেছিল নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে, সমস্তটা আত্মস্থ করে তারপর সেটিকে লেখ্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে। মনের গভীরে সৃষ্টি হওয়া সেই রোমাঞ্চ কীভাবে আমার লেখার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠল, নিজেই টের পেলাম না। তখন যেন আর মীরের গল্প রইল না এটা। মীর সুলতান আহমেদ, অর্থাৎ মীরের আব্বাকে নিয়ে লিখে ফেললাম একটা গোটা অধ্যায়। গল্পের আকারে লিখলেও সেটার প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে মীরের জীবন বৃত্তান্তের মূর্ছনা শুনতে পাই আমি। গোটা অধ্যায়টা একটা ইন্টারভিউতে শেষ করে উঠতে পারিনি বলে, কোথাও কোথাও বেশ ফাঁক থেকে গিয়েছিল। পরে অনলাইন, স্কাইপে, ইমেলে সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছি। অবশ্য এর মধ্যে কোথাও কোথাও ইচ্ছাকৃত ফাঁক রেখেই দিয়েছি। মীরের জবানবন্দিতে যদি পুরোটা লিখে ফেলতাম, একজন লেখক হিসেবে নিজেকে কেমন যেন দেখিয়ে দেওয়া সীমার মধ্যে বেঁধে ফেলতাম আমি। মীরকে নিয়ে লিখতে বসে, মীরের গল্প জেনে, মীর সুলতান আহমেদকে জানতে পেরে যেন একটা গোটা জীবনের উপলব্ধি হয়েছে আমার, মনে হয়েছে এমনভাবেও ঘুরে দাঁড়ানো যায়। তাই কোনও নিয়ম বা নির্দেশ মেনে নয়, এটি একটি রোমাঞ্চ, একটা ভাবনার, একটা মুগ্ধতার আবেশে ভেসে গিয়ে লেখা।

BanglaBook.org

দুই

১৯৬৪ সাল। মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের এক অখ্যাত গ্রামের বাসিন্দা মীর সুলতান আহমেদ গ্রাম ছেড়ে শহর কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন রোজগারের চেষ্টায়। পেছনে পড়ে রইল ভাঙা কুটির, অল্প-স্বল্প চাষের জমি, সার বাঁধা সুপারি নারকেলের গাছ, নির্মল আকাশ আর আঁকাবাঁকা মেঠো

পথ। এসব ছেড়ে যেতে মন কেঁদেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু অর্থ, যা সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার রসদ, সেটা সংগ্রহ করার জন্য শহরের হাতছানি উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাই একদিন এক বুক স্বপ্ন নিয়ে এক অচেনা শহরের বুকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, যে শহরের নাম কলকাতা। মনে ছিল জীবনে বাঁচার তাগিদ। কিন্তু ইঁট, কাঠ, পাথরের কলকাতা তাঁকে কীভাবে অভ্যর্থনা জানাল? রফি আহমেদ কিদয়াই রোডের এক পুরোনো বাড়ির সিঁড়ির তলায় একটি ঘরে থাকতেন এক আত্মীয়। সেখানেই প্রথমে এসে ওঠা। তারপর ধীরে ধীরে কলকাতার বুকে হারিয়ে যাওয়া। এইভাবেই রোজ একবার স্বপ্নের ফেরি হাতে, প্রাত্যহিক খিদের তাড়নায়, রোজগারের আশায় কলকাতার পথে নামতেন সুলতান আহমেদ। গ্রীষ্মের তাপদাহ, শ্রাবণের অঝোর ধারা কোনও কিছুতেই দমতেন না। দিনের শেষে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে শহরের ধুলোবালি গায়ে মেখে ক্লান্ত দেহে নিঝুম অন্ধকারে কলকাতার অলিগলি বেয়ে এসে পৌঁছতেন সেই সিঁড়ির তলার স্যাঁতসেঁতে ভেজা এক চিলতে ঘরটিতে। মীরের তখনও জন্ম হয়নি। গল্পটার শুরু তার আগে থেকেই। শুধু নিছক গল্প বললে অবশ্য ভুল ভাবা হবে। বরং বলা ভালো শহর কলকাতার রাজপথে একজন দিকভ্রান্ত মেঠো পথিকের নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার গল্প এটি। যে মীরকে আমরা চিনি এবং জানি, সেই মীরের জন্ম ও জীবনের ওঠাপড়ার বৃত্তান্ত। পাঠকের কাছে এটি আমার কলমে তৈরি দুঃখ-সুখের, স্বপ্নের আর বাস্তবের আলো আঁধারির জাল বিস্তার মনে হলেও মীরের জীবনে এ এক কঠিন বাস্তব। পিতাপুত্রের এই কঠোর লড়াইয়ের ইতিহাস আজও তার মনের গভীরে বেদনার মূর্ছনা তৈরি করে। তার হাস্যমুখর উচ্ছলতা হারিয়ে যায় চিকচিক করে ওঠা চোখের গভীরে। তবু তারা প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে সংঘর্ষ থেকে মসৃণতার দিকে।

৬৮ নম্বর রফি আহমেদ কিদয়াই রোড। মার্বেলের ফলকে বাড়ির নম্বরটা ইংরেজি হরফে লেখা। তার নিচে আরও বড় অক্ষরে লেখা জেনিংস। বাড়িটা ভুতোরিয়া নামক এক অবাঙালির হলেও, সেখানে ভাড়া থাকত একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবার। সুলতান আহমেদ তাঁদেরই সাব টেনেন্ট হয়ে নিজের শহর-জীবন শুরু করেছিলেন। কিছুদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে এক ইন্টিরিয়র ডিজাইনিং ফার্মে একটা চাকরি জুটেছিল। বহুদিন স্বজনহারা হয়ে থাকায় একাকিত্বের বোঝা হালকা করতে সংসারী হলেন। আজিমগঞ্জের এক গ্রাম্য সরলা কিশোরীকে ঘরনি করে নিয়ে এলেন। শহরের বুকে বেঁচে থাকার লড়াইটা আরও কঠিন হয়ে পড়ল। স্ত্রী মনজুরাকে নিয়ে ঘর বাঁধায় সংসার বাড়ল, কিন্তু মাসের শেষে টাকার অঙ্কটা বাড়ল না। মাত্র ছ'শ টাকায় বাড়িভাড়া

BanglaBook.org

দিয়ে, প্রতিদিনের খরচ চালিয়ে আবার গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠাতে হত। দায়িত্ববোধ এবং নিজের সম্পর্কে উদাসীনতার জন্য নিজস্ব চাওয়া-পাওয়াকে কখনও মূল্য দেননি। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং নিজের ওপর আস্থা রেখে পথ চলেছেন তিনি। নিত্য-প্রার্থনায় ছিল সকলের মঙ্গলকামনা। শুধু নিজের ভারটা যেন ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই সর্বশক্তিমানের ওপরে। প্রবল আর্থিক অনটনকে উপেক্ষা করে সমগ্র পরিবারকে দু হাতে আগলে রেখেছিলেন। শুধু মুখের হাসিটুকু ছিল অমলিন।

একটা অধরা স্বপ্নপূরণের মতোই ছিল মীর সুলতান আহমেদের জীবন। অনেক লেখাপড়া শেখার ইচ্ছেটা অপূর্ণ ছিল, কারণ পরিবার-পরিজনদের অপূর্ণ সাধের, নানা অপূর্ণ চাওয়াকে পূর্ণ করতে তাঁকে জীবনের নিজস্ব সাধগুলোকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। তার মধ্যে লেখাপড়া শেখার ইচ্ছেটা অন্যতম। পারিপার্শ্বিক চাপে লেখাপড়া শেখার ইচ্ছেটাকে তেমন গুরুত্ব দিতে পারেননি। কিন্তু হাতের কাজে ছিলেন দক্ষ, নিপুণ। যখন যেমন-তেমন একটা চাকরি জোটানোই সবথেকে প্রধান হয়ে দাঁড়াল, তখন এই কর্মনৈপুণ্যই হয়ে দাঁড়াল তাঁর জীবিকার উপায়। কিন্তু তাতে পড়াশুনা করতে না পারার খেদ মিটল না। এই খেদ তাঁকে সারা জীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে। বিয়ে করে যার সঙ্গে ঘর বাঁধলেন, তিনিও গ্রাম্যজীবনের অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের শিকার ছিলেন। তাই হাতড়ে বেড়িয়েছেন আলোর দিশা। সে সময় মেয়েদের পড়াশুনার সামাজিক অনুশাসন বেশ কড়া ছিল। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের অন্দরমহলের বাইরে এনে স্কুলে পড়তে পাঠানো বেশ কঠিন ব্যাপার ছিল। সুলতান আহমেদের ঘরনি মনজুরার বাবা-মা নেহাতই দারিদ্র্যে মাটির বাড়ি, খড়ের ছাউনির তলায় তাঁদের কন্যাসন্তানটিকে বড় করে তুলেছিলেন। ওই দম্পতির একমাত্র সম্বল ছিল অল্প কিছু চাষের জমি আর বাড়ির দাওয়ার এক পাশের গোয়ালের কিছু গরু। পাড়ার কয়েকটা বাড়িতে ওই ৪-৫টা গরুর দুধ বয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসতে হত। এগারো ভাইবোনের মধ্যে মঞ্জুরা ছিলেন সবার বড়। কিন্তু কন্যাসন্তান বলে কখনও পিছিয়ে থাকেননি নিজের দায়িত্ব পালন করা থেকে। যখন দেখলেন যে, সংসারের হাল তাঁকেই ধরতে হবে, ওই বোঝা বওয়ার মতো বাবার পাশে আর কেউ নেই, তখন নিজেই সবটা দুহাতে তুলে নিলেন। ভোরের প্রথম সূর্যের সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে দিন শুরু করতেন মঞ্জুরা। দুধের বালতি দু হাতে বহন করে নিয়ে বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসার কাজটা নিজেই করতে শুরু করলেন। প্রথম কয়েক দিন বাবার সঙ্গে, তারপরে একাই ওই ভারী বালতি নিয়ে ধুলোমাখা পথে শুরু হত তাঁর দিন। সকালের সেই হাড়ভাঙা খাটুনির পরে খুব স্বাভাবিক কারণেই দিনের মধ্যভাগে

BanglaBook.org

আর শরীর চলত না। সংসারের আর্থিক টানাপোড়েনে তখন খানিকটা যেন ক্লান্ত তিনি। তাই এবারেও বড় দিদি হিসেবে আত্মত্যাগ করলেন মঞ্জুরা। স্কুলে যাওয়ার পাঠ চুকিয়ে দিলেন। ক্লাস সিক্স অবধি পড়াশুনা করার পর যখন ভাইবোনদের পড়াশুনাটা নিজের থেকে বেশ জরুরি বলে মনে হল, তখন স্কুল, পড়াশুনা এই সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে বাবার পাশে দাঁড়ালেন, যাতে বাকি ভাইবোনের ভবিষ্যত গড়ে ওঠে। তাই দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকারে পড়ে থাকা এই দম্পতি কন্যাসন্তান বিবাহযোগ্যা হওয়া মাত্র সৎপাত্রে মেয়েকে দান করে নিজেদের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিলেন। পড়াশুনা শিখে স্বাবলম্বী হওয়া তো দূরের কথা, মনজুরা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে কখনও সাহসভরে চোখ তুলে তাকাতেও পারেননি। সমাজের রীতি মেনে যখন স্বামীর ঘরে এলেন, পল্লীগ্রামের সবুজে ঘেরা শান্ত নির্জনতা ছেড়ে এসে দাঁড়ালেন কোলাহল মুখরিত ব্যস্ত কলকাতার বুকে, তখনও তিনি লাজুক বধূটি ছিলেন। তারপর কখন যে সুলতান আহমেদের সংসারে গৃহিণী হয়ে কলকাতার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন, সে কথা আজ আর তাঁর মনে নেই। কিন্তু এই জীবনপ্রবাহে যে লড়াই তাঁকে করতে হয়েছিল তার জন্য যে মনের জোর, আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরনির্ভরতার দরকার ছিল তার কোনও অভাব ছিল না মনজুরার মধ্যে। তাই সদ্যবিবাহিত স্বামীর হাত ধরে কলকাতার বুকে এসে আগামী দিনের কঠিন দিনযাপনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন মনে মনে। দারিদ্র্যের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অন্য একটি অচেনা পরিবারের সাব-টেনেন্ট হয়ে ছোট্ট এক চিলতে অন্ধকার ঘরে, খুব কষ্ট করে বেঁচে থাকার দিনগুলোতে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কার মধ্যেও কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন দেখা থেমে থাকেনি। বন্ধুর জীবনপথের এই পথিককে এবং তাঁর অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীকে শহর কলকাতা প্রত্যাখ্যান করেনি। তাঁরাও যেন এই যাদুনগরীর সঙ্গে মিতালি করলেন নতুন আশা, নতুন উন্মাদনা ও নতুন সম্ভাবনায়।

জীবনে এল এক নতুন মানুষ। সুলতান ও মনজুরার পুত্রসন্তান। ঈশ্বরের দেওয়া এই উপহার পেয়ে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। সেই সঙ্গে শপথ করলেন, আত্মজর জন্য পিতা গড়বেন এমন জগৎ যেখানে লড়াই নেই, মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ নেই, হিংসা-দ্বেষ নেই, দারিদ্র্য নেই, খাদ্যাভাব নেই।

এই গল্পের সবটাই মীরের মুখ থেকে শোনা। একদিন ইন্টারভিউয়ের খাতিরে শহরের এক নামী ও ব্যস্ত রেস্তোরাঁয় কয়েক ঘণ্টার জন্য তাকে আটকে রাখা সম্ভব হয়েছিল। পুরোনো সত্যগুলো এবং কিছুটা দেখা ও কিছুটা অদেখা বাস্তব এখনও মীরের হৃদয়ের কতটা গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে, তা জানার জন্যই এই মুখোমুখি হওয়া। এখন তার জীবন খ্যাতির রোশনাইতে

BanglaBook.org

ঝলমল করে উঠেছে, কিন্তু ফেলে আসা দিনের সে অন্ধকারের কালো ছায়া এখনও তাকে মাঝে মাঝে আনমনা করে দেয়। আমাকে অবাক করে সেলিব্রিটি মীর পায়ে হেঁটে রেস্তোরাঁর সামনে এসে হাজির হল। চারিদিকে সাধারণ পথচারীদের ভিড়, কিন্তু তাতে তার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। পায়ে কিটোস, একটা হালকা বাদামি রঙের পুলওভার আর জিন্স পরে, উসকো-খুসকো চুলে শুটিং থেকে সে সোজা এসে হাজির হয়েছে। সে ঢোকা মাত্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রেস্তোরাঁর মালিক ও কর্মচারীরা। সেই সঙ্গে উৎসুক তার গুণমুগ্ধরা। কেউ ছবি তোলার জন্য অনুনয় করে, আবার কেউ বা ব্যাগ থেকে রঙিন কাগজ বের করে সই নিতে চায়। সঙ্গে একটা 'ফানি নোট' হলে তো পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা। সকলের আবদার মিটিয়ে যখন কথা বলতে বসলাম, তখনই ওর মুখের চেহারাটা পালটে গেল। ধরা পড়ল দুই পৃথিবীর মীরের অন্তর্দ্বন্দ্ব। দৃঢ়তা মাখা দৃষ্টি হঠাৎ কেমন দিশেহারা পথিকের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল রেস্তোরাঁর এক কোণ থেকে আরেক কোণে। নিভে যাওয়া চোখে সে ডুব দিল অতীতে। সেই সঙ্গে আমিও যেন ডুবে গেলাম সেই এক বুক অন্ধকারে। ওর অতীত ও বর্তমানের বৈপরীত্যটা আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেল। কিন্তু আলোয় ফেরার পথটা জানা ছিল বলে একেবারে হারিয়ে গেলাম না। আমার এই বই লেখার ভাবনাটা ওর কাছে প্রকাশ করলাম, কারণ চেনা মীরের আড়ালে থাকা অচেনা মীরকে মানুষের কাছে তুলে ধরা দরকার।

"সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।"

দারুণ অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা ও দারিদ্র্যের মাঝে যাঁরা নিরাপত্তা দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, স্নেহের আড়াল দিয়ে তাকে বড় করে তুলেছেন, তাঁদের এই ভালোবাসার ছোঁয়ায় যেন দুঃখটাও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা পেয়েছিল কীভাবে প্রতিকূলতাকে জয় করতে হয়। বলতে বলতে বারবার তার গলা ধরে এসেছে।

"আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলো অনিশ্চয়তার ঝাপসা আলো আঁধারিতে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। কোনওদিন ভাবিনি এইভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যায়। চেষ্টা থাকলে যে এতটাই পাওয়া যায়, সেটাও ভাবতে অবাক লাগে। মনে একটা দৃঢ়তা ছিল যে, নিজের জন্য না হোক, বাবা-মার জন্যই আমাকে অনেক বড় হতে হবে। লড়াই করে জীবনে প্রতিষ্ঠার জায়গাটা জিতে নিতে হবে। জেদটা আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিল। সময় আর

BanglaBook.org

পরিস্থিতি সেটাকে সযত্নে লালন করতে সাহায্য করেছে। বাবা কিন্তু সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর নিত্য লড়াইটা চালিয়ে গেছেন সম্পূর্ণ মনের জোরে। বাবাকে দেখেই হয়তো আমিও শিখেছি। বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহধর্মিণী হয়ে ছিলেন আমার মা। তবু মা-র লড়াইটা ছিল অন্য স্বাদের। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের জগৎ বলে তার যদি কিছু থেকে থাকে, তো সে আমি। সামান্য রোজগারের সংসারে প্রতিদিনের মুখের গ্রাসটুকুকে সাজিয়ে গুছিয়ে সম্পূর্ণ একটা আলাদা ডাইমেনসন দিয়ে দিতে পারার ম্যাজিকটা কোথা থেকে কীভাবে করায়ত্ত করেছিলেন, সেটা আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারি না। মায়ের গোটা পৃথিবীটাই ছিল আমাকে কেন্দ্র করে। আমাকে বড় করে তোলার মধ্যেই ছিল তাঁর স্বপ্নপূরণ।

"সারাদিন ফ্যাক্টরিতে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বাবা ওভারটাইম করে বেশ রাত্রে বাড়ি ফিরতেন। ছুটির দিনেও দশটা-পাঁচটা কাজ। আবার কখনও বাড়তি কিছু রোজগারের জন্য চিঠি টাইপ করতেন। সম্বল বলতে ছিল নিজের একটা টাইপরাইটার। সেটার ভরসায় অনেকটা বাড়তি উপার্জনের সুযোগ এসেছিল এবং এই সাংঘাতিক ব্যস্ত সেডিউলের মধ্যেও বাবা কখন কীভাবে বাড়তি রোজগারের জন্য সময় খুঁজে বের করতেন আমি জানি না। দিনের শেষে যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন অতি সামান্য বা তুচ্ছ জিনিস হলেও আমার জন্য হাতে করে ঢুকতেন। আজও চোখ বন্ধ করলে সে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মাথা নিচু করে বাবা ঢুকতেন সেই সিঁড়ির তলার অপরিসর ঘরে। শরীর জুড়ে তখন তাঁর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ক্লান্তি আর অবসাদ। তবুও মুখে লেগে থাকত এক টুকরো হাসি। এগিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিতেন আমার প্রাপ্যটুকু। তখন তাঁর মুখে থাকত তৃপ্তির আভা। আমার শিশুমনের সেই আনন্দ-উত্তেজনা দেখে বাবার সমস্ত দিনের ক্লান্তি আর অবসাদ যেন দূর হয়ে যেত। আগামী দিনটার যুদ্ধজয়ের জন্য নতুন আশায় নতুন উদ্দীপনায় বুক বাঁধতেন তিনি। মা-র মনেও জেগে উঠত নতুন উদ্যম। জীবনের প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি মুহূর্ত মা-র এগিয়ে চলার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁকে বিচলিত হতে দেখিনি কখনও। বহির্জগতের সংস্পর্শবিহীন, বাতায়নহীন এক চিলতে ঘরের মধ্যে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন আকাশের ব্যাপ্তি। সন্তান ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে যখন স্কুল গেল, লেখাপড়া শিখতে লাগল, ধীরে ধীরে সে শহরের জনসমুদ্রের একজন হয়ে উঠতে লাগল, তখন তিনিও যেন চার দেওয়ালের বাইরে নিজেকে মেলে ধরলেন। যেন আমার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চললেন অচেনা পৃথিবীর বুকে, যে চলা আজও থামেনি।"

BanglaBook.org

কথাগুলো আজ এতদিন পরে এইভাবে সকলের সামনে বলা হয়তো খুব সহজ কাজ নয়। তাই প্রতিষ্ঠার সিংহাসনে বসেও নিজের জীবনের ভগ্ন অতীতটা জমকালো আলোর তলায় মেলে ধরতে গিয়ে সে যেন কেমন দিশেহারা। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন একটা ঝড় উঠেছিল, তারপর আবার সব শান্ত। পথটাও সুনির্দিষ্ট। লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলার যাত্রা আবার শুরু। একটা ভগ্নস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বিস্তৃত চলমান জীবনকে দেখা নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভালোবাসায়। নতুন করে বাঁচতে শেখা বাঁচার মতো করে।

দারিদ্র্য শব্দটা কলকাতার খুব চেনা একটা শব্দ। ছড়িয়ে আছে শহরের প্রত্যেকটি বাঁকে, রাজপথে, অলিতে-গলিতে। ফুটপাথে হাঁটতে গেলে নীল প্লাস্টিকে মোড়া অস্থায়ী ঘর থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর কান্না শোনা যায়। ত্রিফলা আলোর তলায় শহর গৃহস্থালির আবর্জনার স্তূপের পাশে গজিয়ে ওঠা নতুন সংসারে বাস করে কোনও সদ্য বিবাহিতা মেয়ে। তার পরনের কাপড় ছিন্ন, অবিন্যস্ত মাথার চুল, ধুলোমাখা হাত-পা, বাড়ি বাড়ি ঠিকে কাজ করার ক্লান্তি তার সারা শরীরে, তবুও সে ওই প্লাস্টিকের ঘরে সংসার পাতার সুখে সুখী, স্বপ্নে বিভোর। এখনও আধপেটা খেয়ে মুটেরা মোট বয়ে যানজটের রাস্তা পার হয়ে যায় অনায়াসে। তাদের দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশ দিয়ে বিলাসী আরোহীরা হন্ডা সিটি, ফরচুনা বা ইনোভা চড়ে চলে যান। এই বৈপরীত্যের মধ্যেও তারা বেঁচে থাকার রসদ ঠিক খুঁজে নেয়।

এই হতদরিদ্র মানুষগুলোর পাশেই আমরা বহুতল বাড়ির আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটে বসে, চারিদিক বন্ধ করা এসি ঘরে ঘড়ির টিকটিক আর জীবনের গতির মধ্যে অদ্ভুত এক যোগসূত্র তৈরি করতে ব্যস্ত থাকি। ভুলে যাই মাটির মানুষের কথা। যে মানুষদের শরীরের রক্তবিন্দু দিয়ে এগিয়ে চলেছে সভ্যতা, চলছে শহরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। সেদিন মীরের জীবনের কথা শুনতে শুনতে আমার এই কথাটাই মনে হচ্ছিল বারবার — ওর জীবনটা যে বৈপরীত্যে মোড়া, যে লড়াইয়ের মাধ্যমে সে বিপরীত মেরুর এক জীবনে আজ এসে পৌঁছেছে, সে লড়াইটা কঠিনতম এক লড়াই। এই লড়াই তাকে শক্ত ও কঠিন করে তুলেছে। ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি জুগিয়েছে। যদি শহরের কিছু মানুষের মধ্যেও এই শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহলে একদিন হয়তো এই বৈষম্য কিছুটা দূর হবে। জীবনের ছবি পালটে যাবে অগ্রগতির প্রেরণায়।

মীরের জন্ম মুর্শিদাবাদে, মাহিনগরে, দাদুর বাড়িতে। জন্মের পরেই

BanglaBook.org

অবশ্য কলকাতার ৬৮ নম্বর রফি আহমেদ কিদয়াই রোডের বাড়িতে বাবা মায়ের সঙ্গে চলে আসে। ছোট্ট মীরকে সাদর সম্ভাষণ জানায় সেই বাড়ি এবং জেনিংস পরিবার। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এই পরিবারটিতে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের রঙ ওঠা ফাটল ধরা দেওয়াল, দিনের শেষে কয়েক টুকরো মাংসের হাড় আর ওয়াইনের এক সিপের জন্য মারামারি, শহরের বুকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই, এই সবকিছুকে ছাপিয়ে ছিল একটা বিশাল উদার মন। সেই মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে স্থান পেল মীর। পাশ্চাত্যের জীবনবোধ ও পরিবার-চেতনাকে আমরা প্রায় সবসময়ই তাচ্ছিল্য করে থাকি। তাদের অনৈতিকতা নিয়ে যেমন চর্চা করি, তেমন নিন্দাও করি। এমনই কিছু 'অনৈতিক' মূল্যবোধের মধ্যে মীরের অবাধ বিচরণ শুরু হল। রিপন স্ট্রিটের লাগোয়া রফি আহমেদ কিদয়াই রোডের মীর থেকে জ়ি বাংলার মীরের এই খ্যাতির পেছনে সেই মূল্যবোধের সবচেয়ে বড় অবদান।

মীরের কথায় — "ছোটবেলায় আমার যত আবদার, তার প্রায় সবটাই ওদের কাছে। আমার ইংরেজি ভাষা রপ্ত করার ক্ষেত্রে জেনিংস পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এমনকী অ্যাসেম্বলি অব গড চার্চ স্কুলে ভর্তি হবার অনুপ্রেরণাটাও ওদের কাছেই পেয়েছিলাম। আমার শৈশবে বাবা-মায়ের যে অমানুষিক পরিশ্রম, প্রতিনিয়ত যে স্ট্রাগল, তার এক ভাগও আমি সেই সময় বুঝিনি। আমার ইংরেজি-ভাষী বন্ধুরা কখন যে আমার বাবা-মায়ের অজান্তেই আমার ভবিষ্যত গড়ছিলেন, সেটা তখন উপলব্ধি করিনি। এখন বুঝি সবটাই। সব অঙ্কটাই কোথাও কেউ হয়তো কষে রেখে দেন। হিসেবটা হয়তো আমরা জীবন দিয়ে মিলিয়ে দিই, তাও সেটা তাঁরই পরিচালনায়। আমার জীবনে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির ওই পরিবারটির প্রভাব আমি সবসময় অনুভব করি। আমার ইংরাজি শেখা, স্কুলের পড়াশুনায় সাহায্য করা, শহরের আদবকায়দা শেখা — সবটাই তাঁদের জন্য। ইট ওয়াজ আ ক্যালকুলেটেড গেম প্ল্যান।"

জেনিংসদের কথা বলতে বলতে মীর আবারও আনমনা হয়ে পড়ে। সর্বক্ষণ ছুটে চলার মধ্যেও অতীত যেন ওর নিত্য সহচর। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হচ্ছিল না যে, গল্পগুলো বছর তিরিশ আগের। ওর বলার ভঙ্গীতে, শব্দ প্রয়োগে ঘটনাগুলো যেন নতুন প্রাণ পেয়ে চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠল। এর পরের ঘটনাগুলো তাই শুনতে শুনতে বেদনায় ভরে উঠল মনটা। অনেক চেষ্টা করেও চোখের পাতার ভিজে ওঠাটা আটকাতে পারলাম না।

"আমি যা পেয়েছি, এতটা যে পাব আশা করিনি কখনও। মাঝে মাঝে

BanglaBook.org

ভাবি, একদিন এই শহরেই কিছু ক্ষমতাবান মানুষ আমাদের মাথার ওপর থেকে ছাদটুকু কেড়ে নিয়েছিল। এত বড় শহরে কোথাও একটু মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজে পাইনি আমরা। আর আজ কলকাতা শহরের বুকের ওপর তিনটে ঠিকানা আমার। রিপন স্ট্রিটের বাড়ির সিঁড়ির তলার সেই অপরিসর নিচু ছাদের ঘরে আমার দীর্ঘকায় বাবা মাথা নিচু করে ঢুকতেন। কয়েক বছর আগে আমার খোলামেলা ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাবাকে বলেছিলাম, 'এই শহরেরই বুকের ওপর আকাশের কাছাকাছি মাথা তুলে দাঁড়াও। বুক ভরে নিঃশ্বাস নাও খোলা হাওয়ায়। মুঠো ভরে আলো ভরে নাও তোমার ঝুলিতে। এই শহরের আর কিছু নেবার নেই তোমার কাছ থেকে। এবার তোমার দুহাত ভরে পাবার পালা।'"

কিছুক্ষণের জন্য আমার কলম থেমে গেল। অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ আর পশ্চাদপটে ফেলে আসা চরম অপমান ও লজ্জার দিনগুলির ছায়া — এই দুটি বিপরীতধর্মী অনুভূতির খেলা চলছিল তার মুখের রেখায় ও রঙে। আমাকে অবাক করে দিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা এক মীর ধরা দিয়েছিল আমার সামনে। জানি না আমার কলমের জোরে সেই মীরকে আমি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারব কিনা। যে মীরের প্রত্যেকটি কথায় দূরদর্শনের দর্শকবৃন্দ অপার আনন্দের সন্ধান পায়, তার পাশাপাশি আমার চোখের সামনে আসীন এই মীরকে তুলে ধরলে হয়তো বা জীবনের আলো আঁধারের খেলার নিগূঢ় রহস্যেরও সমাধান মিলবে।

অল্প সময়ের স্তব্ধতা কাটিয়ে আবার ফিরে গেলাম অন্ধকার অতীতে। মীর বলে উঠল, "আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে শুনছিলাম আমাদের বাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে। জেনিংসদের সঙ্গে ভুতোরিয়াদের একটা কেস চলছিল কিছুদিন যাবৎ। ছোটবেলায় কোর্ট, কেস, পুলিশ এসব তেমন বুঝতাম না। মাথাও ঘামাতাম না। মা বলতেন, এই বিষয়গুলো ছোটদের জানবার দরকার নেই। তাই আমার রঙিন কল্পনার জগতে এই সব সমস্যার প্রবেশাধিকার ছিল না। তবুও সমস্যার গুরুত্ব অনুযায়ী আমি আমার মতো করে মনের মধ্যে একটা নকশা বানিয়ে নিতাম। সবটা না বুঝলেও এটুকু বুঝতে পারছিলাম যে বাবা মা একটা আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে আছেন। আলোচনাগুলো আমার আড়ালে হলেও একদিন আমি জানতে পারলাম যে, জেনিংসরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেছিলাম। একা হয়ে যাবার একটা অজানা অনুভূতি আমাকে বিমর্ষ করে তুলেছিল। মনে হয়েছিল ওদের ছাড়া যেন জীবনপথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ব। ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি, 'তোমরা কোথায় যাবে?' ওরা কিন্তু আমাকে আশাহত করেনি। বলেছে, 'আমরা চলে

BanglaBook.org

যাব তো কী হয়েছে? এবার তুমি আসবে আমাদের কাছে।' দুঃখটা চলে গিয়ে তখনকার মতো মনটা কল্পনার রঙে মিশে উড়ে গেছে ওদের অজানা ঠিকানার উদ্দেশ্যে। মুহূতের মধ্যে কত কী যে ভেবে ফেলেছিলাম ঠিক নেই, ভাবিনি শুধু এইটুকুই যে ওরা সত্যি একদিন আমাকে ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে, হগ সাহেবের মার্কেট, টানা রিক্সা আর সবশেষে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এমনভাবে উধাও হয়ে যাবে ওদেরই হাতে গড়া মধ্য কলকাতার রাস্তাঘাট ছেড়ে। তারপর একদিন আইনগত টানাপোড়েনের ফলে ওরা সত্যিই এই বাড়িটা ছেড়ে চলে গেল। সেদিন ওদের শূন্য ঘরে ফাটল ধরা দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে বলেছিলাম, 'আমাকে ছেড়ে কেন চলে গেলে?' তখন জানতাম না যে, যে ইঁটকাঠগুলোকে আমার নিজের বলে আঁকড়ে ধরেছিলাম, যে পরিবারটিকে আপন বলে মনে করেছিলাম, সেগুলো কোনওদিনও আমার ছিল না। তাই একাকিত্ববোধটা বড় বেশি বেজেছিল। ওদের শূন্য ঘরে ফেলে যাওয়া আসবাব ও পুরোনো বইখাতার মধ্যে ওদের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছি। সেই একান্ত মনখারাপের দিনে নিজের সঙ্গে নিজেই বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করলাম। তারপর দিন কেটে গেছে। নিজের অজান্তেই কখন যেন বড় হয়ে উঠলাম। বারো বছর বয়সে আমার মধ্যে এক নতুন 'আমি'কে আবিষ্কার করলাম আর তাকে নিয়েই ব্যস্ত রইলাম কিছুদিন। এরপর আমাদের পরিবারে এল চরম দুঃসময়। সেই দিনটা এখনও ছবির মতো স্পষ্ট।

"৩১শে আগস্ট, ১৯৮৭। সকাল থেকে আকাশটা যেন কালো মেঘের ওড়নায় মুখ ঢেকে ছিল। হয়তো আমাদের আসন্ন বিপদের বার্তা দিচ্ছিল। বাবা সকাল থেকে কয়েকবার বেরিয়ে নামাজের সময় বাড়ি ফিরে এলেন। ততক্ষণে আমিও স্কুল থেকে ফিরে দিনের মধ্যভাগের প্রার্থনার জন্য তৈরি হচ্ছি। মা তাঁর ছোট্ট সংসারের হাজার কাজ সেরে আমায় আর আমার মনখারাপের ঝুলি নিয়ে বসেছেন। শরীর থেকে ক্লান্তিটা দূর করে তবেই নামাজ পড়তে বসবেন। অবশেষে প্রার্থনা শেষ। মধ্যাহ্নভোজের আয়োজনও সম্পূর্ণ। এমন সময় একদল লোক হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। ওরা কারা, কেনই বা এমন করে ভেতরে ঢুকে এল সেটা বোঝার আগেই বাবা আমাকে আর মাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই অনাহুতের দল কিছু বোঝার আগেই ঘরের জিনিসপত্রের সঙ্গে আমাদেরও রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, একরকম জোর করে ধাক্কা মারতে মারতে। লজ্জায়, অপমানে বাবা নত চোখে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। মার চোখ অশ্রুসজল, আমি হতবাক। একে একে আমাদের গৃহস্থালির সব জিনিস ওরা বাইরে ফেলে দিল। সেগুলো জড়ো হল ফুটপাথের ওপর। আমাদের

BanglaBook.org

ভাত খাবার থালাগুলো দেখলাম ডাস্টবিনের ধারে পড়ে আছে। রান্না করা ভাতের হাঁড়িটা উলটে গিয়ে ভাত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মূহূর্তের মধ্যে দুটো কুকুর ও একদল কাক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে। মা ততক্ষণে শাঁক সংগ্রহ করে ফেলেছেন। তিনি হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়া থালা, বাসন, ঘটি, বাটি একত্রিত করতে লাগলেন। ওদের এমন আসুরিক কাজের হয়তো কিছুটা প্রতিবাদও করতে গেলেন। কিন্তু ওদের শক্তির কাছে আমরা যে কত ক্ষুদ্র, তা তখনই উপলব্ধি করলাম। চরম অপমান ও নিষ্ঠুরতার দুঃখে শহর কলকাতার ফুটপাথের ওপর নিজের হাতে গড়া সংসারের ভগ্নস্তূপের ওপর বসে কেমন দিশেহারা চোখে চেয়ে রইলেন মা। প্রতিবাদ করার মতো মনের জোর থাকলেও ওদের শক্তির কাছে অসহায়ভাবে হার মানা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না তখন। বাবা কিন্তু ভেঙে পড়েননি তখনও। বরং মার অসহায় কাতর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে চলেছেন, 'তপন, এটাই হয়তো সব থেকে খারাপ। এরপর হয়তো আর খারাপ কিছু নেই। এটাই হয়তো শেষ! এটাই শেষ!' বাবার সেই কথাটা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। বারো বছর বয়সে এ কথার অর্থটা আমি ভালো মতন বুঝতে পারিনি। কিন্তু সেই মুহূর্তের ঘটনা, মাথার উপর ছাদহীন অবস্থায় রাস্তায় বসে থাকা, মার অশ্রুজল, বাবার কাতর অসহায় দৃষ্টি, চরম লজ্জা ও অপমান এই সবকিছু যেন হঠাৎ আমার বয়স অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, এই দুটো মানুষের আমি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন গভীর দৃষ্টিতে। হয়তো ভাবছিলেন আমার কিশোর মনের গভীরে এই ঘটনা কতটা ক্ষত সৃষ্টি করবে। আমার শূন্য-মনের হাহাকার ও বেদনা আমি প্রকাশ করিনি বাবার কাছে। আমি জোর করে নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছিলাম। কেমন করে পেরেছিলাম জানি না, শুধু মনে হয়েছিল, আমার দুর্বলতাটা আমি কিছুতেই ওঁদের সামনে মেলে ধরব না। আমার মনের দৃঢ়তা দিয়ে আমি বাবাকে সেদিন বুঝিয়েছিলাম, আমি তারই মন্ত্রে দীক্ষিত। আমার মনের ভিতরটা তখন ক্ষত বিক্ষত। জন্ম থেকে এই বাড়িটার সঙ্গে ভালোবাসার গ্রন্থিতে আটকা পড়ে গেছিলাম। আমার পড়াশুনা করার সেই ছোট্ট কোণ, আমাদের ঘর, আমার খেলাঘর, কোনটার জন্য বেশি কষ্ট হচ্ছিল জানি না। কিন্তু এটুকু বুঝেছিলাম, আমার কষ্টের কণামাত্র প্রকাশ না করে, যদি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বাবার পাশে আগামী দিনের আশ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে পারি, তাহলে হয়তো আমার কষ্টটাও একটু লাঘব হবে। বাবা বলেছিলেন, 'ওরা আমাদের গৃহহারা করতে পারে, কিন্তু আমার সংসারটাকে তো ভাঙতে পারবে না। আমাদের সংসার অটুট, আমরা অবিচ্ছেদ্য।' বিরাট এই পৃথিবীতে, বহুদূর ব্যাপ্ত এই শহর কলকাতায়

BanglaBook.org

কোথাও যে একটা মাথা গোঁজার জায়গা পাব সে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কেমন করে সে আশ্রয়ে পৌঁছাব, জানা ছিল না। ঠিকানাহীন আমরা রাস্তা থেকে গৃহস্থালির প্রত্যেকটি জিনিস কুড়িয়ে একত্রিত করে বাবা, মা আর আমি এসে দাঁড়ালাম কলকাতার রাজপথে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বাবার দিকে, আমার আর মায়ের একমাত্র ভরসা। জীবনের আশ্বাস, নিরাপত্তার আশ্বাস...”

বাকি কথাগুলো আর বলা হল না। তার আগেই গলা বুজে এল। সবার অলক্ষে চোখটা মুছে নিয়ে মীর চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। আমিও স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। এই নীরবতা ওর মনের মধ্যে ওঠা ঝড়টাকে শান্ত করতে সাহায্য করল। আমার ক্লান্ত লাগছিল। মনের মধ্যে ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। পরের কথাগুলো জানার আগ্রহ ছিল ঠিকই। কিন্তু সেই মুহূর্তে জানতে ইচ্ছে হল, মীরের যে হাস্যোচ্ছল, প্রাণচঞ্চল রূপটা আমরা দেখি, তার আড়ালে ও কীভাবে লুকিয়ে রাখে জীবনের এই বেদনার দিকটা। উত্তরটা আমি খুঁজে বেড়াব শেষ পর্যন্ত।

এতক্ষণ ব্ল্যাকবেরিটা বন্ধ ছিল। কথা শেষে ফোন অন করা মাত্র দিনের পরের সেডিউলের অ্যালার্ম বেজে উঠল। সময় সমাপ্ত। সেদিনের মতো ইন্টারভিউ শেষ করে মীর হারিয়ে গেল জনতার ভিড়ে। কালো কাঁচের আড়ালে, চকচকে গাড়ির ভেতর সেলিব্রিটির তকমা এঁটে ফেলে আসা সময়টাকে মনবন্দী করে মীর ফিরে গেল শুটিং সাইটে, কোনও এক নতুন চরিত্রে অভিনয় করার জন্য।

এরপর বেশ কয়েকদিন মীরের সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। প্রধানত ওর ব্যস্ততার কারণেই। সেদিনের পর হয়তো আমার আরও খানিকটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। সেদিন বিকেলে ইন্টারভিউ শেষে বাড়ি ফিরে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমার পাঁচতলার বারান্দায় সেই প্রিয় কোণটায়। নিচে রাস্তা দিয়ে চেনা মুখের মানুষের যাতায়াত লক্ষ করতে করতে জীবনের সহজ স্বাভাবিক ছন্দটা নতুন করে আবারও আরেকবার খুঁজে পেলেও, আমি আমার ভাবনার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। জানি না, সত্যি কোনও ঐশ্বরিক শক্তি মীরকে অন্ধকারে পথ দেখিয়েছিল সেদিন। হয়তো বা যেটাকে আমি অপার্থিব শক্তি বলে মনে করার চেষ্টা করছি সেটাই আসলে ওর মনের জোর। মীরের জীবনের এই ঘটনাটা হয়তো সবাই জানে। আমিও আগে অনেকবার অনেক জায়গায় এই ঘটনাটা পড়েছি। কিন্তু সেদিন মীরের সামনে বসে এমন বৃত্তান্ত শোনার পরে চেনা গল্পটা যেন নতুন করে আঘাত করল আমায়। আর শুধু তাই না। ৬৮ নম্বর রফি আহমেদ কিদয়াই রোডকে ঘিরে মীরের আজও যে

BanglaBook.org

নস্টালজিয়া, সেটা আমায় কেমন যেন নাড়া দিয়ে গেল। হয়তো আমাকে আমার শহর কলকাতার অনেকটা কাছে এনে দাঁড় করাল। কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে সেদিন এই কলকাতাকেই কেমন যেন অচেনা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই ভাবেই এমন ক্ষমতা আর অর্থের আশ্রয়েই কি নিজের নরম কোমল স্নিগ্ধ রূপটিকে ভুলে এগিয়ে চলবে আমার শহর? তিলোত্তমা কলকাতার মায়াবী রূপটা কি সত্যি তাহলে অর্থ, বৈভব আর প্রাচুর্যে ঘেরা? মীরের এই শহর তো আমারও শহর। আমার সবটা এই শহর থেকেই পাওয়া। অথচ ওর মতো করে শহরটাকে ভালোবাসতে আমি কিন্তু পারিনি।

প্রতিবার যখন উড়োজাহাজে চেপে আমি আমার শহরটাকে পেছনে ফেলে, সূর্যটাকে ছেড়ে, বর্ষার মেঘটাকে ভুলে, বসন্তের আবেশকে ভুলে পাড়ি দিই পশ্চিমে, আমার শরীরের রোমে রোমে তখন কান্নার রোল ওঠে। আমি পেছনে ফেলে যাই কত সহস্র না বলা কথা, কত না ঔৎসুক্য। কত ব্যথা আর সেই সঙ্গে রেখে যাই অপেক্ষা। পৌঁছিয়ে ফোন পাবার অপেক্ষা, আবার দেখা হবার অপেক্ষা। তাই হয়তো সেবার মীরের সঙ্গে কথা বলার পরে, ওর নস্টালজিয়ার খানিকটা বুকের মধ্যে নিয়ে আমিও নামলাম, কলকাতার পথে। আমার শৈশব, আমার বাস্তবের অনেকটাও যে মীরের মতোই ছড়িয়ে রয়ে গেছে এই শহরের পথেঘাটে, খানিকটা অনাদরে। কত কিছু একসঙ্গে মনে পড়ে গেল। আমার পাড়ার বাজারের সবজিওয়ালা, ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ, বাসে বাদুড় ঝোলা, অগুনতি গাড়ির হর্ন, লাল সবুজ মিছিল, আলো ঝলমলে পার্ক স্ট্রিটের মাঝরাত, ক্লান্ত অবসন্ন রিক্সাওয়ালার শতছিন্ন গেঞ্জি, 'শিল কাটাও' বলে হাঁক দিয়ে যাওয়া লোকটা, কাঁধে জল বোঝাই ভারী, এমন ছোট ছোট আরও কত কী! কত চেনা বৈচিত্র্য, খেয়াল না করা অভ্যাস হয়ে যাওয়া বৈষম্য, ছোট্ট চড়াই, কুকুরের লড়াই, বাসনওয়ালির হাঁক, দড়ির ভিজে কাপড়, সেই পুরোনো হারিয়ে যাওয়া কাঁসার ঘটি। খতিয়ে দেখলে এই বৈষম্যের মধ্যেই কলকাতা বেঁচে থেকেছে, আর শহর কলকাতার এই বৈষম্যকে ঘিরেই মীরের জীবন।

সেদিন এই সূত্র খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌছলাম ৬৮ নম্বর রফি আহমেদ কিদয়াই রোডে, দাঁড়ালাম এসে মীরের ফেলে আসা ওই বাড়িটির সামনে। মীরের মুখ থেকে শোনা বাড়িটির বর্ণনা বর্তমানের সঙ্গে মেলে না। বাড়িটিকে আলাদা করে দেখলে কোনও বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু মীরের কথা ভেবে যখন বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন যেন

BanglaBook.org

মনে হল ওখানেই ওর সমগ্র শৈশবটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। সময়ের প্রবাহে বাড়িটি পুরোনো কলকাতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আর সেই সঙ্গে মীরের আর পরিবারের জীবনের অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথায় কথায় তাই মীর সেদিন বলেছিল, "আমাদের ঠিকানা পালটে গেলেও, সেটা কাউকে কোনওদিনও জানতে দিইনি আমি। বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরেও অনেকদিন আমার বন্ধুরা জানত আমার ঠিকানা ৬৮ নম্বর রফি আহমেদ কিদয়াই রোড।

বাড়িটির বর্তমান বাসিন্দারা মীরকে চেনেন একজন স্বনামধন্য তারকা হিসেবে। বলা বাহুল্য, টিভির পর্দার আড়ালে আসল মীরের যুদ্ধটার কথা তাঁরা হয়তো কেউ কখনও জেনেই উঠতে পারেননি। আর শুধু তাঁরাই বা কেন? কলকাতার কেউ কি কখনও জানতে পেরেছেন, প্রতিদিন দিনান্তে টিভির পর্দায় যে মানুষটা সবার 'স্ট্রেসবাস্টার' হয়ে হাজির হয়, তার জীবনের শুরুটা এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন? মীরের জীবনের সেই অন্ধকারের কথা তুলে ধরব বলে অবশ্য এই বই লিখতে বসিনি আমি। সেই ঘটনাগুলো প্রত্যেকটা আমায় নাড়া দিয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ওর কথাগুলো শোনার পরে, উপলব্ধি করার পরে মনে হয়েছিল, সারা বাংলার মানুষ জানুক এমন একটা স্বপ্নিল, জেদি, পরিশ্রমী মানুষটিকে, যার মনের জোরে অন্ধকারের মধ্যে হাজার আলো জ্বলে ওঠে। যার চিন্তায়, যার ভাবনায় অন্ধকারে তলিয়ে যাবার ভয় নেই। যেটা আছে, সেটা শুধুই স্বপ্ন আর বুকভর্তি সাহস। মীর নিজে কখনও সে স্বপ্নের কথা, সাহসের কথা লোকের সামনে মেলে ধরেনি। বরং সবার সামনে বার বার বলেছে যে, তার মতো ক্ষুদ্র একজনকে নিয়ে বড় করে ভাববার কিছুই নেই। অথচ এই মীরই হাসি আর আনন্দ দিয়ে জীবনের বাকি সব ইমোশনের চেহারা পালটে দেখাবার ক্ষমতা রাখে। দুঃখবিলাসের কোনও জায়গা নেই ওর জীবনে। সবটাই 'গো অ্যান্ড গেট ইট'। সবটাই কঠিন বাস্তব। ওর অতীত নিয়ে কখনও ও কোনও দুঃখপ্রকাশ করেনি। বরং অতীতটা নিয়ে আলোচনার সময় ওর গলায় অন্য সুর বেজে ওঠে সব সময়। সেটা ওর জীবনের একটি শিক্ষণীয় অধ্যায়। সেখান থেকেই আরও আরেকবার ঘুরে দাঁড়ানো, ফুরিয়ে যাওয়া থেকে আরও আরেকবার ফিরে পাওয়া।

সেদিন কলকাতার পথে নেমে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলাম নতুন করে নস্টালজিয়ার ভিন্ন এক রূপ। আমার সঙ্গে শহরের ছেঁড়া তারটা জোড়া লাগানোর তাগিদও ছিল খানিকটা। সেদিন আমার শহর আমায় কতটা আপন করেছিল জানি না, কিন্তু মীরের শৈশব-পরিত্যক্ত ওই বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন কলকাতাকে মীরের মতোই ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়েছিল। অতীতের

BanglaBook.org

আবর্তের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া আমার সাংবাদিক সত্তাটাও খুঁজে পেয়েছিলাম সেখানে। তখনই মনে মনে ঠিক করেছিলাম বইটা আমায় লিখতেই হবে। আর সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে নতুন উদ্যমে, নতুন অনুপ্রেরণায় লিখতে বসলাম বইটা। আমার শহরের জন্য, শহরবাসীর জন্য, আর মীরের জন্যও বটে।

রাস্তা থেকে সংসার বুকের মধ্যে আগলে নিয়ে মীর পরিবার পরের দিনগুলো কেমন করে কীভাবে কাটিয়েছিলেন, সে কথা শুনেছিলাম একটা ভিন্ন সাক্ষাৎকারে। ৬৮ নম্বর রফি আহমেদ কিদয়াই রোড ছেড়ে চলে যাবার জায়গা ছিল একটাই — কলকাতার বসবাস তুলে দিয়ে মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে ফিরে যাওয়া। কিন্তু ঘটনার এক মাসের মধ্যেই মীরের মিড টার্ম পরীক্ষা। আজিমগঞ্জে ফিরে যাওয়া মানেই তাই কলকাতার পড়াশুনার পাট চুকিয়ে সম্পূর্ণ অন্য রকম একটা জীবনের দিকে এগিয়ে চলা। কিন্তু গ্রামের অশিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি — এসবের জন্য তো সুলতান আহমেদের এত দিনের লড়াই নয়। সবটুকু যে তাহলে মিথ্যা হয়ে যাবে! সেই আশঙ্কায় জীবনের সেই চরম অনিশ্চয়তার মুহূর্তেও তাই সুলতান আহমেদ স্থির করলেন মীরের জন্যই গ্রামের নিশ্চিন্ত সুরক্ষিত নীড়ে ফিরে যাবেন না তিনি। যে করেই হোক পড়াশুনা চালিয়ে যেতেই হবে।

"সেই দুঃসময়ে আব্বা শুধু আমার কথাই ভেবেছিলেন। বলেছিলেন, এমন কোথাও একটা থাকতে হবে, যেখান থেকে স্কুলে যাতায়াত করা সুবিধা হবে। আর ঠিক সেই কারণেই বাবা বিনা দ্বিধায় আমাদের নিয়ে উঠলেন তাঁর পুরোনো অফিসে। একটা কারখানায়। শুরু হল আমাদের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। সারাদিন মেশিনের ঘড়ঘড় শব্দ। মানুষের কর্মব্যস্ততা। কোলাহল। সেই কর্মমুখর কারখানার এক কোণে আমরা তিনজন এসে দাঁড়ালাম। আম্মির দিকে হেসে আব্বা বললেন, 'নাও, এমন একটা নতুন জীবনের স্বাদ নিয়ে নাও। পরে হয়তো আর সুযোগ পাবে না।' আর আমার আম্মি? কোন অজানা শক্তি যে আম্মিকে সবকিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা জুগিয়ে যেত, তা আমি এখনও বুঝি না। কারখানার সেই ধুলোমাখা অন্ধকার কোণে আম্মি তাঁর নতুন সংসার বিছিয়ে বসলেন। সেইখানেই আমাদের খাওয়া, আমাদের থাকা, আমার পড়াশুনা আর স্বপ্ন দেখা।"

কথাগুলো সেদিন রূপকথার মতো শুনতে লেগেছিল। আমরা যারা, সারাটা জীবন একটা নিশ্চিত আশ্রয়ে, বিনা পরিশ্রমে জীবনের সবটুকু পেয়েও

BanglaBook.org

ছোট-ছোট না পাওয়ার দুঃখে কাতর হই, তাদের কাছে এটা নিছক রূপকথাই বটে। অথচ প্রতিষ্ঠিত মীরের জীবনের এটি একটি অতিবাস্তব অধ্যায়। এই জীবনটাই হয়তো মীরকে মীরের মতো করে গড়ে তুলেছে। আর তাই হয়তো এই জীবন আর সেই জীবনের মধ্যে এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মীর নিজে সেই ফাঁকটা কখনও তৈরি হতে দেয়নি। আর একান্ত নিজের করেও রেখেছে সেই প্রত্যেকটা প্রহরকে। সেদিন কথা বলতে বলতে যখন জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন করে পেরেছিলে ওই অল্প বয়েসে সবটা সহ্য করতে?" মীর হেসে উত্তর দিয়েছিল, "এই জীবনটা তো সেই সময় স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। শুধু ভাবতাম, যেমনটা চলছে তেমনটা থাকবে না। একদিন পালটে যাবেই। আজকের যেটা আমার খুব চেনা সুখ, সেটা সেদিন কল্পনা ছিল। আজকের এই চেনা জীবনটা সেদিন অজানা অচেনা ছিল। আর এই অচেনার সন্ধান মিলবে বলেই হয়তো সেই কষ্টগুলো তখন কষ্ট বলে মনে হয়নি"।

আজকের এত যশ, এত খ্যাতির মধ্যেও মীরের ফেলে আসা অতীতটাই ওর কাছে ঘোর বাস্তব। আর বর্তমানটা? মীরের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হলে, "এটাই তো রূপকথা বস!"

কারখানার অন্দরমহলে দ্রুত এগিয়ে চলল মীর পরিবারের রাত্রিদিন। মীর তার প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দ মিলিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল তার দিন, তার রাত, অবশ্যই অল্প কিছুদিন। তারপরই আবার বাসা ভাড়া করে অন্যত্র উঠলেন সুলতান আহমেদ। হারিয়ে যাওয়া ঘর-সংসারকে আরেকবার নতুন করে এই কলকাতার বুকে ফিরে পাওয়ার জেদ তাঁদের তাড়া করে বেড়াতে থাকল। ঠিকানা তখন ৩৩ বি, শরিফ লেন, কলকাতা।

তিন

২০০৬ সালে, ১২ জুন মীরাক্কেল প্রথম শুরু হয় জ়ি বাংলায়। বাংলার দর্শকের কাছে এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান। 'কলকাতাবাসী' তখন সবে রেডিওর রেভোলিউশনে ভেসে আসা, 'আর জে মীর'-এর গমগমে গলার আওয়াজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। টিভির পর্দায় খবর পড়ার নতুন আঙ্গিক নিয়ে মীরের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ওকে আরও খানিকটা সাফল্য অর্জন করতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া টলিউডের অ্যাওয়ার্ড ফাংশানে, বা অন্য কোনও বড় মঞ্চে ওর উপস্থাপনা, উপস্থিত বুদ্ধি, উইট আর হিউমার ইতিমধ্যেই মীরকে বাঙালির অনেকটা কাছে এনে হাজির করেছিল। ঠিক

BanglaBook.org

সেই সময় জ়ি বাংলা মীরকে নিয়ে এল তারই নিজস্ব মঞ্চে, আর তার সঙ্গে নিয়ে এল একদল অত্যন্ত গুণী শিল্পীদের, যাঁরা মীরের স্বভাবজাত হিউমারের মোকাবিলা করে ওকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সৃজনশীল এবং প্রতিভাবান। ২০০৪ সালে স্টার ওয়ানের পর্দায় গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জে স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান হিসেবে মীরকে প্রথম দেখা যায়। সেখানে প্রথম দশ জনের মধ্যে নির্বাচিত হওয়ার পরেও ফাইনালে প্রথম ছ জনের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারেনি মীর। গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জে ব্যর্থতা মীরের জীবনের যেমন টার্নিং পয়েন্ট, তেমনই মীরাক্কেলের মঞ্চে মীরের উপস্থিতি বাংলা কমেডি জগতে এক অন্যতম নতুন সূচনা। চলচ্চিত্রের বাইরে কমেডি নিয়ে আলাদা ভাবে কিছু ভাবতে জানত না বাঙালি তখনও। চলচ্চিত্রের পর্দায় একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের ভূমিকায়, চিত্রনাট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে এতদিন অসংখ্য প্রতিভাবান শিল্পীরা তাঁদের যে অনবদ্য পারফর্মেন্স দিয়ে গেছেন, তার তুলনা পাওয়া বিরল। তুলসী চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়ের মতো শিল্পীদের অনবদ্য অভিনয় ক্ষমতা এবং স্ক্রিন প্রেজেন্স বাংলা সিনেমার জগতের একটি অন্যতম দিক। সেই জায়গা থেকে বাঙালির রসবোধ, বাঙালির মজ্জাগত রসবোধকে বের করে এনে সম্পূর্ণ অন্যভাবে উপস্থাপনা করে মীর মীরাক্কেলের মঞ্চে।

নতুন যা কিছু, তা খুব স্বাভাবিক ভাবেই সমালোচনা এবং আলোচনার বিষয়। কিন্তু মীরাক্কেলের প্রথম দিকের সমালোচনার ঝড় কাটিয়ে মীর আর তার টিম আজ যে জায়গায় শো-টিকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে, তার জন্য তাদের কুর্নিশ জানাই। মীরাক্কেলের মঞ্চে অন্যভাবে আরেকবার মীর তার জেদ, অধ্যবসায় প্রমাণ করেছে। স্ট্যান্ড-আপ কমেডিকে এক অন্য জায়গায় নিয়ে এসেছে শুধুমাত্র তার উইট, উপস্থিত বুদ্ধি, বাচনভঙ্গী আর সাধারণ জ্ঞানকে পুঁজি করে। সঙ্গে নকল করার অসাধারণ শিল্পটা তো রপ্ত করাই ছিল। মীরাক্কেলের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ মীর নিজেই। বলাই বাহুল্য, যাদের কাছে এই অনুষ্ঠানটি অপসংস্কৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়, তারাও একদিন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছে মীরের সাহস ও বুদ্ধি দুইই আছে। বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব মেনে সমাজব্যবস্থার নানা দিক নিয়ে সমালোচনা করেছে মীর এই শো-তে। মীরাক্কেলের এই মঞ্চ সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে মন খুশি করে দেওয়ার মঞ্চ, শুধুই হাসির খোরাক মেলে সেখান থেকে। হাজার কটূক্তি সত্ত্বেও মীরাক্কেলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পিছপা হয়নি মীর। কারণ তার মূল মন্ত্র ছিল, 'ইউ কান্ট এফোর্ড টু লাফ আনলেস ইউ লাফ অ্যাট ইওরসেলফ'।

BanglaBook.org

মীর খুব সহজে সব অপমানকে ভুলে যেতে পারে। সবকিছু হেসে উড়িয়ে দেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মীরের। আমায় অনেকেই তাই বলেছে, মীরের সঙ্গে ঝগড়া করে আনন্দ নেই। এমন উদাহরণ শুধু যে মীরের সংস্পর্শে যারা এসেছে, তারা বলবে, এমনটাও নয়। প্রয়াত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের 'ঘোষ এন্ড কোম্পানি' নামক টক শো-তে মীর এবং ঋতুদার যে অম্লমধুর কথোপকথন হয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে এসেও মীর বলেছিল, "ওঁর খুব খারাপ লেগেছে, উনি দুঃখ পেয়েছেন, তাই এত কথা বলেছেন।" যখন এতদিন পরে আমার সঙ্গে এক অন্য সাক্ষাৎকারে আলাদা করে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি কেন ওঁকে কপি করতে? তোমার জন্য সারা পৃথিবীতে হাসির রসদ খুঁজে পাওয়াটা তো খুব বড় ব্যাপার ছিল না কোনদিনও, তাহলে কেন? তুমি জানতে তোমার কপি করাটাকে উনি খুব স্বাভাবিক ভাবে, নিছক মজা হিসেবে নিতে পারেননি। হয়তো বা উনি একটু বেশি স্পর্শকাতর?" মীর সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, "আমি কোনদিনও ঋতুদাকে ভ্যাঙাব বলে ভ্যাঙাইনি। এই ভ্যাঙানো শব্দটাতেই আমার আপত্তি। আমি কেবলমাত্র একটা গোষ্ঠীর, যারা একটু আলাদা সাধারণের থেকে, তাদের নিয়ে নিছক একটা হিউমার তৈরি করার চেষ্টা করেছি। তাহলে সিনেমায় তো অন্ধ লোকের অভিনয়ই করা উচিৎ নয়। সেটাও তো এক প্রকার অন্ধ মানুষদের কপি করা। আর সবথেকে বড় কথা, আমি ঋতুদার শো-তে গিয়ে অপমানিত হয়েছিলাম বলে তার প্রতি আমার সব রেসপেক্ট কমে যাবে এমনটাও নয়। আমি সহজে ভুলে যেতে পারি অনেক কিছু। আর সত্যি মনেও রাখি না অনেক কিছু। ফরগিভ ইজ আ বিগ ওয়ার্ড ফর মি। আই বিলিভ ইন ফরগেটিং থিংস। আর এটাও আমার মনে হয়, আমি যদি জীবনের অনেক ক্ষেত্রে রাগ, অভিমান, অপমান এই সবকিছু নিয়ে চলার কথা ভাবি, আমি আমার নিজের এগিয়ে চলার পথে নিজেই বাধা সৃষ্টি করব। আমি সবসময় ভাবি, আমি যতটুকু পেয়েছি, সেটাও আমি সত্যি ডিজার্ভ করি কিনা। আমার সামনে কোনদিনও কোনও শর্টকার্ট ছিল না। প্রত্যেকটা সিঁড়ি কষ্ট করে, অনেক পরিশ্রম করে উঠে এসেছি আমি। আর সেটা সম্পূর্ণ নিজের জোরে। ঋতুদা আজ আর নেই আমাদের মধ্যে। ওঁর মতো একজন শিল্পীর না থাকাটা অনেক ক্ষেত্রে অনেক শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু উনি আজ না থাকলেও ওঁর প্রেজেন্সটা কোনও না কোনও ভাবে থেকে গেছে। আমিও ওঁকে মনে রেখেছি আমার মতো করে। কোনও ক্ষত না, কোনও আঘাতও না, জাস্ট মনে পড়লে মাঝে মাঝে কোথায় যেন একটা চিনচিন করে।"

BanglaBook.org

এমন অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে মীরের, যা তার মনের অনেক গভীরে, হাজার ব্যস্তভার বোঝায় চাপা রয়ে গেছে। মীর নিজেও কখনও এগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। করার সময়ও পায়ান। শুধু কাজের ফাকে মাঝে মাঝে ফিরে দেখা নিজের জীবনটার দিকে। মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নও দেখে সে। এতগুলো সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে যে কঠিন মনোবল তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, হঠাৎ যেন সেই মনের জোরের সবটুকু কোথায় তলিয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে, পুরোনো দিনের হিসেব নিকেশের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে তাই হঠাৎ করে বলে উঠেছে, "ওয়াট ইফ আই লুস মাই ভয়েস সাম ডে?" দুঃস্বপ্ন নয়, এমনটা তো হতেই পারে। মীরাক্কেলের মীরের জীবনে মিরাক্‌ল ঘটেছে বহুবার। তাই সব দুঃস্বপ্নগুলোকে ভোলার ক্ষমতাও সেখান থেকেই আপনিই জোগাড় হয়ে গেছে।

৬৮ নম্বর রফি আহমেদ কিদয়াই রোড থেকে ৩৩ বি শরিফ লেন। আর তার মাঝে মাঝে আজিমগঞ্জের নিবিড় গ্রামের খড়ের চালের মাটির দাওয়া। ভাবতে বসলে মনে হয়, এতটা পথ মীর কেমন করে পাড়ি দিয়েছিল। উত্তর মেলে ওর কাছ থেকেই।

"উমেশচন্দ্র কলেজ থেকে বি কম অনার্স পড়ছি আমি। ফার্স্ট ইয়ারেই তখন। কলেজ থেকে বাড়ি এসে বসামাত্র আম্মি বললেন, 'ইস্তিরিওয়ালার কাছ থেকে জামা কাপড়গুলো নিয়ে আয়।' প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন কলকাতায়। আর বর্ষায় কলকাতায় রিক্সা ছাড়া গতি নেই। সুতরাং আম্মি আমার হাতে রিক্সাভাড়া দিয়ে বললেন, 'একবার ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরেছিস, আর ভিজিস না।' আমিও আম্মির কথা মতো একটি রিক্সা নিয়ে এসে পৌঁছলাম রামশরণ যাদবের দোকানে। আমি রিক্সাটাকে দাঁড় করিয়ে রামশরণের কাছ থেকে জামাকাপড়গুলো নিলাম। বৃষ্টিতে ভিজে যাবার ভয়ে একটা পুরোনো ইকনমিক টাইমসের কাগজে জামাগুলো মুড়ে, আমি রিক্সায় উঠে বাড়ি ফিরে এলাম। এর পরের ঘটনাটা মীরের কথা যারা জানেন, তাদের সবার জানা। কারণ মীর আজও বিশ্বাস করে সেদিন এফ এমের চাকরিটার কথা ও জানতেও পারত না, যদি না রামশরণ ওই ইকনমিক টাইমসের পাতায় জামাকাপড়গুলো মুড়ে দিত। আর শুধু কাগজটা হাতে পেয়ে বিজ্ঞাপনটি পড়া নয়, এমন একটি দিনে ওটা হাতে আসে, যে তারিখ হিসেব করে মীর জানতে পারে, অডিশনের শেষ দিন, ঠিক তার পরের দিনটিতেই।

"অডিশন দিতে গিয়েছিলাম কোন প্রিপারেশন ছাড়া। কিন্তু এটুকু জানতাম

BanglaBook.org

যে, রেডিও জিনিসটার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। সুতরাং কোথাও থেকে একটা কনফিডেন্স পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এই চাকরিটা আমার জন্যই। সত্যিই আমার জীবনের অনেকখানি জুড়ে রেডিও। আজিমগঞ্জে আমার দাদু মীর আসগর আলি থাকতেন মাটির বাড়িতে। সুপুরি নারকেল গাছের ছায়ায়, দাওয়ায় বসে বসে সারাদিন রেডিও শুনতেন। আমাদের বাস্তবটাকে রেডিওর প্রোগ্রামে অনেকটা দূরে সরিয়ে রাখা যেত বলে, আজিমগঞ্জে গেলে আমি দাদুকে আর দাদুর রেডিওকে ছাড়তে চাইতাম না। যা গল্প শুনতাম 'গল্পদাদুর' আসরে, আমার দাদু পরে সেগুলোকে আমার মতো করে বলতে বলতেন। কখনও আবার বলতেন, এই লাইনগুলো তুলসী চক্রবর্তীর মতো করে বল। এগুলো ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো করে বল। এমনটা করতে করতে দেখলাম, শুধু যে আমি ওঁদের ফলো করছি তা নয়, আমি আমার বাড়ির সবাইকে তাঁদের বর্তমান মানসিক পরিস্থিতি থেকে অনেকটা আলাদা করে নিয়ে গিয়ে হাসাতে পারছি। তখন মনে হতে লাগল, রেডিও আমায় হাসাতে শেখাচ্ছে। আর আমি অন্যকে আনন্দ দেওয়াটাও শিখছি। দুটোর মধ্যে একটাই কমন ফ্যাক্টর — রেডিও। মনে মনে তখন ঠিক করলাম, এই চাকরিটা আমার আর আমায় সেটা পেতেই হবে।

"একদিনের মাথায় নিজেকে তৈরি করলাম। পরের দিন গিয়ে পৌঁছলাম টাইমস এফ এম-এর অফিসের সামনে। তখন মনের মধ্যে কী যে হচ্ছে! ৭৫ জনের সঙ্গে আমিও নাম লেখালাম, কলকাতার নতুন 'আর জে' হিসেবে নিজের জীবনটাকে গড়ে তুলব বলে। রেডিও জকি হিসাবে শুরু হল আমার জীবনের নতুন একটি অধ্যায়।

"৬ই আগস্ট, ১৯৯৪। সৃষ্টি হল আমার অনন্য একটি পরিচয়। আমার স্বপ্নের প্রথম সোপান। মাসের শেষে তখন আমার পকেটে ১২৪৩ টাকা। কিন্তু সেই টাকার অঙ্কের থেকে অনেক বেশি মূল্যবান যেটা ছিল আমার কাছে, তা হল আমার স্বাধীনতা। আর জীবনটাকে জানার, চেনার অনন্য এক সুযোগ।"

চার

মীরাক্কেলের বিতর্কে মীরাক্কেল বিখ্যাত।

মার দিয়া মক্কেল, টকঝাল ককটেল
আ আ আ মীরাক্কেল।

BanglaBook.org

২০০৬। শুরু হয়েছিল মীরাক্কেল। '১২ই জুন হেসে খুন'।

ব্যান্ডেজ, মীর আর নতুন অতিথি, অর্থাৎ সেলিব্রিটিরা, রাস্তায় ঘুরে নানান ধর্মের বর্ণের মানুষের সঙ্গে কথা বলত মীর। আর সেই সব ঘটনা রেকর্ড করে সম্প্রচার করা হত। সপ্তাহে একদিন 'মীরান্ডা' নামের একটি সেগমেন্টে মেকওভার করে অন্য কারোর চেহারা নিয়ে মীর নিজেই তার সঙ্গে বার্তালাপ করত। কোনওদিন মীর বনাম গব্বর সিং, তো কোনওদিন মীর বনাম পি সি সরকার। আর সেখানে মীর নিজেই গব্বর সিং বা পি সি সরকার সাজত। অনেক সময় এদিক-ওদিক থেকে অভিনেতা জড়ো করে লোক হাসানোর চেষ্টায় অটল থেকেছে মীরাক্কেল। কিন্তু এরকম করে বেশিদিন চালানো গেল না। শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, যিনি মীরাক্কেলের শো-টির পরিচালক, তাঁর সঙ্গে যখন একটি সাক্ষাৎকারে মীর এবং মীরাক্কেল নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন উনি এরকমই সুন্দর ভাবে বর্ণনা দিয়েছিলেন।

"তখন প্রতি শুক্রবার টি আর পি আসত। ইস্কুলে যেমন পিছনের বেঞ্চে জায়গা পেতাম, অফিসেও তেমন আমার ডাক পড়ত সবার শেষে। কারণ মীরাক্কেল তখন ০.২ কিংবা ০.৩। কিন্তু আমরা ততদিনে আমাদের শিরায় ঢুকিয়ে ফেলেছি এক নেশা। পাগলামির নেশা, যেমন খুশি হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করার নেশা।"

"পার্ক সার্কাস চার নম্বর ব্রিজের পাশে অটোর লাইনে দাঁড়িয়ে", শুভঙ্কর এই ঘটনাটি এত বিস্তারিতভাবে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে এইখানে আমি ওঁকে হুবহু কোট করলাম। মীরাক্কেলকে আমি ওঁদের বা ওঁর মতো করে কাছ থেকে দেখিনি বলে এখানে আমার ভাবনা বা শব্দগুলো হয়তো বা একটু খাপছাড়া লাগবে।

"পার্ক সার্কাস চার নম্বর ব্রিজের পাশে অটোর লাইনে দাঁড়িয়ে। ফোন বাজল। শুক্রবার সকালের এই ফোনগুলো সারাদিন ডাউন করিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। শুকনো গলায় জানতে চাইলাম, আর পড়েছে? ও প্রান্ত থেকে কোনও শব্দ নেই। এক, দুই, তিন, তারপরই চিৎকার। মীরাক্কেল ২.২। ছিটকে লাইন থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। মনে হয়েছিল এক ছুটে পার্ক স্ট্রিট পৌঁছে যাই। পাঁচতলার কাচ ঘেরা কেবিনে ঢুকে ফার্স্টবেঞ্চারদের সামনে কলার তুলে কিছু না বলে শুধু দুবার শিস দিয়ে পায়চারি করি। পরবর্তীকালে এই রেলা মারার সুযোগ মীরাক্কেল আমায় অনেক বড় করে এনে দিয়েছিল। চেনাজানারা অনুষ্ঠানের শেষে আমার নাম দেখে আমায় ফোন করে তখন। অনেকে অনুষ্ঠানে এসে জোকস্‌ও বলতে চায়। আর ঠিক তখনই ভাবা হল, যদি হাসানোর একটি প্রতিযোগিতা করা যায়। তারপর অডিশন আর তারপরই

BanglaBook.org

মীরাক্কেল আক্কেল চ্যালেঞ্জার ওয়ান।

"সেই থেকে শুরু। সবশেষে এটুকু বলার। মীরাক্কেলের সবথেকে বড় সার্টিফকেট, সেদিন নিজের চোখে দেখলাম, এক ডাক্তার প্রেসাক্রুপসনে লিখেছেন, সুস্থ থাকতে মীরাক্কেল দেখুন।"

শুভঙ্কর সত্যি সেদিন পিঠটা এগিয়ে দিয়েছিলেন। আর আমি সুদূর এই বিদেশ থেকে আমার হাত চাপড়িয়ে বলেছিলাম, ওয়েল ডান। সত্যি! গোটা মীরাক্কেল অনুষ্ঠানটায়, প্রত্যেকটা সিজনে, দর্শক হিসেবে আমরা বেশ কিছু গুণী শিল্পী উপহার পেয়েছি। গৌতমদার ও গিন্নির পাঁচালি, স্বরূপ স্যার, অতনু বর্মন, মৃদুল ভট্টাচার্য — এঁরা প্রত্যেকে গুণী শিল্পী।

সত্যি মানুষকে হাসিয়ে আনন্দ দেওয়াটাও যে একটা শিল্প, এমনটা অনেক বাঙালি বিশ্বাসও করতে চায় না। "মীরাক্কেল যে হাসির জন্ম দিয়েছে, সে তো ভাঁড়ামি।" "বাড়িতে ছোটদের সামনে একসঙ্গে বড়দের সঙ্গে বসে মীরাক্কেল দেখা যায় না।" "অপসংস্কৃতির চূড়ান্ত।" — মীরাক্কেল যত এগোচ্ছে, সমালোচনার ঝড় যেন আরও ঘনীভূত হচ্ছে। আর এখানে মীরের ভূমিকাটা ঠিক কী? শুভঙ্কর ঠিক বলেছিলেন, "মীর হল একটা রসের ভান্ডার। এত প্রতিভা ওর মধ্যে যে ওকে নিয়ে অল্প ভাষায় যেমন কিছু বলা মুশকিল, তেমনি এ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দ খুঁজে পাওয়াও বেশ কঠিন।" যারা পার্টিসিপেন্ট, তাদের গ্রুমাররা তৈরি করেছে। এক একটা সিজনে জন্মেছে নতুন স্ক্রিপ্ট রাইটার। মীরাক্কেল গোটা একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্ম দিয়েছে। কত অচেনাকে, অজানাকে, কত রকমের মানুষকে একটি মঞ্চে এনে তাদের নতুন পরিচয় গড়েছে। তাই সাক্ষাৎকারান্তে, শুভঙ্কর বুক ফুলিয়ে বলে উঠলেন, "মীরাক্কেল একা বড় হয়নি। যে সময়টা রাজ চক্রবর্তী সিনেমা ডিরেক্ট করবে বলে মীরাক্কেল ছেড়ে চলে গেল, দায়িত্বটা আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। তল পেতে অনেক সময় লেগেছিল। মোটামুটি হাফ বুঝি, হাফ বুঝি না এমন একটা অবস্থায় মীরাক্কেল বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞার শুটিং ফ্লোরে একদিন মাইক হাতে চোখ বন্ধ করে অ্যাকশন বলে দিলাম। তারপর দেখলুম এন্ড স্ক্রলে আর ই পি নয়, একেবারে ডিরেক্টর হিসেবে নাম যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী, আমি যে মীরাক্কেলে এসে অনেক কিছু করেছি, তা কিন্তু নয়। মীরাক্কেলের এক একটা সিজন দিয়ে গেছে পরের সিজনের গ্রুমার, স্ক্রিপ্ট রাইটারদের। শুধু মীরাক্কেলই বা বলি কেন? একটু চোখ মেলে তাকালে টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিতে যারা ক্রিয়েটিভ লেখালেখি করছে, তাদের অনেকেরই মীরাক্কেলের অন স্টেজ অথবা অফ স্টেজ কাজ করার সুযোগ এসেছে। আর শুধু এখানে নয়। ঢাকায় যখন

BanglaBook.org

আবু হেনা রনির হোর্ডিং দেখেছি, সজল জামিলদের ছবি সিনেমার পোস্টারে দেখেছি, গর্বে বুক ভরে গেছে।"

মীরাক্কেল যেমন সকলকে নিয়ে এগিয়ে এসেছে এতটা পথ, তেমনিই মীরও মীরাক্কেলকে আঁকড়ে ধরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রত্যেকটা এপিসোড, প্রত্যেকটা সিজনে, প্রতিবার, নতুন উদ্দামতায়, নতুন উত্তেজনায় যেন সেজে উঠেছে নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে। যারা ওকে 'ভাঁড়' বলে তাচ্ছিল্য করেছে, যারা ওকে অপসংস্কৃতির ভাণ্ডার বলেছে, তাদের সকলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জোর গলায় কলকাতার তথাকথিত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিপরায়ণ সমাজের সামনে টিভির পর্দায় বলে উঠেছে 'অ্যসাম শালা'। এখানে না বলে পারছি না যে, কলকাতার ঠেকে গজিয়ে ওঠা 'শালা' নামক এই শব্দটি শিক্ষিত রুচিবান মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য। অথচ পাশ্চাত্যের স্ল্যাং, যা শালা শব্দের থেকে অনেক বেশি জোরালো, সেগুলো কিন্তু অনায়াসে যোগ হয়েছে তাদের ভাষার অভিধানে।

মীরাক্কেল নিয়ে দারুণ শোরগোলের মধ্যে পড়ে মীর যখন প্রায় অতিষ্ঠ, তখনই একবার কথা বললাম ওর সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, "এ্যাডাল্ট জোকস শুরু হয়েছে আজকাল মীরাক্কেলে। তুমি অন স্ক্রিন তাকে বেশ প্রশ্রয়ও দিচ্ছ। ব্যাপার কী?" অল্প হেসে মীর বলেছিল, "যাদের পোষায় না, তারা দেখবে না।" কথাটা সত্যি। যাদের পোষায় না, তারা যদি নাও দেখে, তবুও মীরাক্কেলের টি আর পি কমে না। আজকাল এন্টারটেনমেন্টের ধরন পালটে গেছে। যে কোনও কিছু স্পাইসড আপ, নাহলে সেটাকে এন্টারটেনমেন্টের পর্যায়ে ফেলে রাখা যায় না আর। খুব সহজে রুচিশীল বাঙালিয়ানাকে 'আঁতেল' বলে উড়িয়ে দিয়ে, চলতি ভাষায় পথচলতি মানুষের ভাষায় অনুষ্ঠানকে উপস্থাপনা করার মধ্যেও যে চরম সাহসের দরকার, সেটা মীরাক্কেলের টিমের সকলের মধ্যে চিরকাল ছিল এবং সেই সাহসে ভর করেই এতটা পথ এগিয়ে চলা হয়তো।

মীরাক্কেল নিয়ে সে সময় কলকাতায় যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল তার কিছুটা আঁচ অবশ্যই এসে পৌঁছেছিল মীরাক্কেলের এই গোটা টিমের ওপরেও। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে 'নেগেটিভ পাবলিসিটি' বা 'কন্ট্রোভার্সি ভাঙিয়ে' প্রোগ্রামের টি আর পি হুড়হুড় করে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। সেটা প্রোগ্রামের বাণিজ্যিক দিক। নিঃসন্দেহে আজকের বাজারে 'কমার্শিয়াল হিট' ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাববার কথাও নয়। আর হয়তো সেটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু সবকিছু হয়তো 'স্বাভাবিক' আর সাদা কালোর নিয়ম মেনে চলে না। 'মীরাক্কেল' নামক এই শো-টির পেছনে তাই হয়তো একটা অনন্য মনন, একটা শিল্পী সত্তা কাজ করে। যেটা আপাতদৃষ্টিতে, হাসতে হাসতে সহজে

BanglaBook.org

চোখে পড়ে না। অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন, অনেক কঠিন বাস্তব, অনেক ঘটনা, ঘাত প্রতিঘাত, আশা নিরাশা যেন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে এই টিভি শো-টির সঙ্গে। যে কোনও রিয়ালিটি শো বুঝি বা এমনই হয়ে থাকে। তবে মীরাক্কেল যে সেগুলোর থেকে আলাদা। মনের গ্লানি মুছিয়ে একটু নির্ভেজাল আনন্দ দেওয়াই ছিল মীরাক্কেলের মূল লক্ষ্য। আর এই কঠিন দিনযাপনে, এত সহজে হালকা সুরে, ভেসে বেড়িয়ে, হেসে এবং হাসিয়ে গত আট বছর ধরে মীরাক্কেল যে ভাবে বিবর্তিত হয়েছে, সেটা অন্তত একজন দর্শক হিসেবে আমায় নাড়া দিয়ে গেছে। নিজের সন্তানের মতো টিমের প্রত্যেকটি মানুষ শো-টিকে 'আরও ভালো' করে তোলার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেক মুহূর্তে আরও ভালো, আরও হাসি, আরও আনন্দের খোঁজে অটল গোটা মীরাক্কেল টিম। সেখানে যে কোনও রকমের নেতিবাচক ব্যাপারই সুখকর নয় কারুর কাছেই। বলা বাহুল্য, মীরের কাছে তো নয়ই। যে শো-এর একমাত্র লক্ষ্য মানুষকে শুধু একটু হাসানো, সেখানে রুচি, সংস্কৃতি, সেন্সার, আনসেন্সার — এত ভারী ভারী শব্দগুলোর হয়তো বা কোনও জায়গাই নেই।

মীরাক্কেল আমায় যেমন একদিকে হাসায়, প্রতিদিন মনের কালি মুছিয়ে দিয়ে যায়, তেমনই অন্যদিকে আমায় খানিকটা ভাবায়ও বটে। যদিও এই ধারণাটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মীরাক্কেল দেখার পর, আমি একজন বাঙালি হিসেবে নিজের সমালোচনা করতে শিখেছি। বাঙালির রুচি, বাঙালির সংস্কৃতি নিয়ে যে উন্নাসিক একটা ভাব — সেটা কতটা ভিত্তিহীন, সেটা বোঝার ক্ষমতা একদিকে যেমন কলকাতা থেকে বাইরে এসে দেখেছি, অপরদিকে মীরাক্কেল আমার এই ধারণাটিকে আরও স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে। চিরকাল জেনে এসেছি, শিক্ষা আর সংস্কৃতির মধ্যে একটা মিল আছে। আর সংস্কৃতি শব্দটির সঙ্গে সব সময়ে জড়িয়ে থেকেছে 'ক্লাস'। সুতরাং শিক্ষা, সংস্কৃতি সমাজে ক্লাসটাও নির্ণয় করে দেয়। শ্রেণী বিভাজনের এমন অনন্য পদ্ধতি শুধুমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভব হয়তো।

যাই হোক, সে সম্পূর্ণ অন্য কথা। অন্য প্রসঙ্গ। মীরাক্কেল বাঙালির সংস্কৃতির তকমা লাগানো অনুষ্ঠান না হয়েও বাঙালিরই অনুষ্ঠান। মীরাক্কেলের জনপ্রিয়তা সব তর্কের ঊর্ধ্বে। সেখানে কার কতটা অবদান, মীরের শিক্ষার মূল্যায়ন, ওর রুচি, ওর মাত্রাছাড়া ভাষার প্রয়োগ এই সবকিছু নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলেও মীরাক্কেলের টি আর পি তরতর করে বেড়ে গেছে। অপসংস্কৃতির মঞ্চ বলে, যারা মীরাক্কেল শুরু হলে চ্যানেল বদলে দিয়েছে, যারা মীরের গায়ে ভাঁড়ের তকমা এঁটে দিয়েছে, তাদের জন্য হয়তো সত্যিই

BanglaBook.org

মীরাক্কেল নয়। তবুও মীরাক্কেলের জয়জয়কার শহর জুড়ে। আর তার মূল কারণ হল হাসি আর আনন্দ। টিভির পর্দায় মাত্র এক ঘণ্টা। আর বাকিটা? বাকি সময়টা জুড়েও শুধু আনন্দ। এমন আনন্দ, এমন উৎসাহ, এমন হাসি আর যেন কোথাও খুঁজে পাওয়া ভার। মীর নিজে অবশ্য সে আনন্দের অন্য এক অনবদ্য নাম দিয়েছে। খানিকটা জোর করেই। প্রায়ই ওকে বলতে শুনি, "মীরাক্কেল মানে পাগলামি। যা ইচ্ছে করা। শুধু হাসো, আর হাসাও। বাকি আর কিছুর দরকার আছে কি?"

সত্যি হয়তো দরকার নেই। আর সেটা বোঝা যায় মীরাক্কেলের সেটে উপস্থিত হলে।

আগস্ট মাসের শেষের দিক হবে। এমন একটা অভিজ্ঞতার তারিখ, দিন, ক্ষণ সবকিছুই মনে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি বিশেষ কোনও কারণে। কারণটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

সকাল তখন দশটা মতো বাজে, আমায় মীর ফোন করে বলেছিল রেডিও মির্চির অফিসে বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছে যেতে। অবশ্যই কলকাতায় গেলে একবার ওর সঙ্গে দেখা তো হয়ই, কিন্তু সেদিনটি বিশেষ করে এই বইয়ের আলোচনার জন্যেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। রেডিও মির্চি করে বেরিয়ে মীরাক্কেলের সেটে যাওয়ার সময়টাই শুধু ফাঁকা ছিল সেদিনের সেডিউলে। সুতরাং রাস্তায় যেতে যেতে কথা সেরে ফেলতে হবে। বহু বছর পরে আমি অফিসের দিনে, ভরা কলকাতার ব্যস্ত রাস্তায় ওইভাবে কোনও সেলিব্রিটির জন্য অপেক্ষারত। সত্যি তখন মনের মধ্যে একটা অন্য তোলপাড়। খানিকক্ষণ লাগল সেটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে। নেদারল্যান্ডসে যখন সাক্ষাৎকার নিতে যাই, অনেকেই অপেক্ষা করিয়ে রাখেন কারণে-অকারণে। সেখানে একটা অদ্ভুত অন্য রকমের আপ্যায়ন।

যাই হোক, সেদিন আমি সময়ের আগেই ক্যামাক স্ট্রিটের শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-এর সামনে এসে হাজির হলাম। নীচ থেকে ফোন করতে, ফোন রিং হওয়া মাত্র তুলে মীর বলেছিল, "শতরূপা, নীচে গাড়িতে অপেক্ষা করো। সৌরভকে বলা আছে। ওর নাম্বার আমি তোমায় এস এম এস করে দিচ্ছি। ওকে ফোন করে জেনে নাও গাড়ি কোথায় পার্ক করা।" তখনও আমি জানি না, সৌরভই গাড়ির চালক। পরে যখন ওর সঙ্গে আড্ডাটা জমে উঠেছিল, তখন জেনেছিলাম, যেদিন শুটিং থাকে, সেদিন প্রোডাকশনের গাড়ি এসে মীরকে তুলে নিয়ে যায় মির্চির অফিস থেকে। আর মীরাক্কেলের প্রোডাকশনের যে গাড়িগুলো মীরকে নিয়ে যায়, তাদের প্রত্যেকের নাম ওর জানা।

BanglaBook.org

গাড়ি খুঁজতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। কারণটা নতুন করে বলার আর অপেক্ষা রাখে না। সৌরভ পেছন থেকে 'দিদি' বলে ডেকে না উঠলে ব্যাপারটা হয়তো আরও খানিকটা সমস্যার হয়ে যেত। অবাক হয়ে বললাম সৌরভকে, "তুমি আমায় চিনলে কী করে?" সৌরভ অবলীলায় বলে উঠল, "চিনি না তো, এখন চিনলাম। ভিড়ের মধ্যে প্যাসেঞ্জারকে আইডেন্টিফাই করাটাও যে আমার কাজের মধ্যে পড়ে দিদি।" কলকাতার রাস্তায় হুট করে পাতানো এরকম ভাই আকছার হয়। কিন্তু সৌরভকে যেন ভোলার নয়। ওর কথার উত্তরে আমি অল্প হেসে বললাম, "গাড়িটা কোথায় গো? একটু খুলে দেবে, আমি ওয়েট করি গাড়িতে বসে।" সৌরভ বলল, "গাড়ি রাস্তায়, আমি ডাবল লাইনে পার্ক করেছি। কোথাও জায়গা পাইনি। পুলিশের গাড়ি দেখলেই চালিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। আবার ফিরে এসে পার্ক করছি সেই ডাবল লাইনেই।" আমি হেসে উঠে বললাম, "বাঃ বেশ মজা তো! আর যদি পুলিশ ধরে, তখন ফাইন?" "হ্যাঁ ফাইন তো বটেই। লাইসেন্স নিয়ে কেস দেবে। মীরদার গাড়ি বললে অবশ্য জানি না কী বলবে। আমরা তো ভাড়ার গাড়ি চালাই। আমাদের লাইসেন্স নিয়ে নিলে ঝামেলা।" ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা চোর-পুলিশ খেলার গন্ধ পেলাম। ব্যাপক লাগল। মনে হল আমি কেমন যেন তাসের দেশ থেকে আবার নিজের দেশে ফিরে এসেছি। নিয়ম মতে চলতে চলতে সত্যি বেশ হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। এবারে এই কার্বন ডাই অক্সাইডেও প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেব। সৌরভের সঙ্গে গল্প করতে করতে জানতে পারলাম, সৌরভরা দিনের কুড়ি ঘণ্টা কাজ করে। কখনও বা চব্বিশ ঘণ্টাও। মাসে টিপস শুদ্ধ হয়তো বা পাঁচ হাজার টাকা রোজগার। আর উপরি হল, কলকাতার তথাকথিত সেলিব্রিটিদের কালো কাঁচের পেছনে, এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়ির মধ্যে আসল মানুষটার সম্মুখীন হওয়া।

"কত নায়ক-নায়িকাকে আমার এই গাড়িতে নিয়ে গেছি। শুটিং যখন দূরে দূরে থাকে, ওনারা তো অনেক সময় গাড়িতেই মেক আপ করেন, গাড়িতেই থাকেন। আমরা অবশ্য সে সময়টা গাড়ির মধ্যে অ্যালাউড নই। তবুও জানেন দিদি বেশ লাগে। সারা কলকাতার লোক যাদের একবার এক ঝলক দেখবার জন্যে পাগল, তাদের আমি ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে বসেন, আবার কেউ কেউ টেলিফোনে থাকেন। কারুর বয়ফ্রেন্ড নিয়ে প্রবলেম, কারুর অন্য প্রেমিক আছে, অন্য কোথাও, অন্য কারুর সঙ্গে লটঘট। আমরা সবটা জানি, সবার সবটা। আমি এম এ পাশ। কিন্তু চাকরি পাইনি। আমার দাদা এ লাইনে অনেকদিন হল আছে। দাদা এখন সিনেমার প্রোডাকশনে ভাড়া খাটে। আর আমি এই মীরাক্কেলে।

BanglaBook.org

এর পর কোথায় যাব জানি না। ভাড়ার গাড়ি তো, কোনও ঠিক নেই, কখন কোথায় থাকি।"

সৌরভকে আরেকটু সময় দিলে হয়তো আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যেত, কিন্তু বাধ সাধল মীর। মীরের প্রোডাকশনের গাড়িতে, চোর পুলিশ খেলতে খেলতে, রুপোলি পর্দার সঙ্গে কঠিন বাস্তবটা মিলিয়ে দেখতে বেশ লাগছিল। কিন্তু অন্যদিকে ঘড়ি যে অন্য কথা বলছে। মীর নেমে এসে আমাদের খুঁজে না পেয়ে সৌরভকে ফোন। আমরা তখন দুজনেই গল্পে মগ্ন। কিন্তু ফোন আসা মাত্র সৌরভ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে মীরের দিকে ছুটে গেল। কাঁধ থেকে ল্যাপটপ ব্যাগ নিয়ে, হাত থেকে লাঞ্চ বক্স নিয়ে গাড়িতে রেখে, ফরমাল শেফারের মতো দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকল সৌরভ। মুখে চোখে ওর তখন অন্য রকমের পেশাদারিত্ব।

গাড়িতে উঠে মীরকে দেখে মনে হল, এখনও গোটা দিনটা ওকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। সেই সকাল সাড়ে ছটায় মির্চির অফিসে এসে শো শুরু করতে হয়েছে ওকে। তখন প্রায় বেলা সাড়ে এগারোটা। ক্যামাক স্ট্রিট থেকে মীরাক্কেলের শুটিংয়ে যাওয়ার পথটি বেশ দীর্ঘ। অফিস টাইমের জ্যাম ঠেলে স্পটে পৌঁছতে দেড় ঘণ্টা বা পৌনে দুঘণ্টা তো লেগেই যায়। ওকে দেখেই মনে হল ও বেশ ক্লান্ত। ঘণ্টা তিন-চারেক ধরে বকবক করে স্বাভাবিক ভাবেই ক্লান্ত হবার কথা। গাড়িতে উঠে তাই প্রথম কথা মীর বলল, "এটা আমার পাওয়ার ন্যাপ নেওয়ার সময়।" "ঘুমের বাধ সাধলাম তো?" কথাটা শোনা মাত্র ওর নিজস্ব সুরে বলে উঠল, "হ্যাঁ, তা তো বটেই।" তারপর গাড়ির সিটের উপর ফেলে রাখা আমার ফাইলটা দেখে বলে উঠল, "এই ফাইলটা কীসের? এত মোটা?" আমি বললাম জীবনকথার খাতার পাতা। যতটা রোমাঞ্চ হচ্ছিল এটা বলতে গিয়ে ঠিক ততটা বেরসিক ভাবে মীর বলে উঠল, "বাবা রে! কী এত লিখেছ? এত বড় তো আমার জীবনই নয়।" বড় কোনও কিছুর মাপ ঠিক কীভাবে করা যায় আমি জানি না। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আয়তন এগুলো দিয়ে মাপা যায় নিশ্চয়, তবে তেমনভাবে মাপার মাপকাঠিটি আমার কাছে নেই। বিশেষত যখন এই বইটি লিখতে বসলাম, তখন তেমন মাপকাঠি নিয়ে কাজ করব ভাবতেও পারিনি। ছোট বড় বিচার করবার সত্যি আমি তো কেউ নই। আর অনধিকার চর্চা করেও কোনও লাভ হয় না সাধারণত। তাই মুচকি হেসে বললাম, "তুমি বড় হয়েছ কতটা জানি না, তবে বুড়ো হয়েছ। চুলগুলো বেশ পেকেছে।" স্বভাবজাত হালকা সুরে মীর বলল, "পেকেছে বোলো না। এটা আমার সল্ট এন্ড পেপার লুক।"

BanglaBook.org

বাকি সময়টা গাড়িতে বইয়ের ব্যাপারে বিশেষ কথা হল না। কারণ তখন আমি মীরাক্কেল নিয়ে বেশি উত্তেজিত। প্রায় দুটো নাগাদ মীরাক্কেলের শুটিং স্পটে পৌঁছলাম। একটা বিশাল জায়গা জুড়ে ম্যারাপ বাঁধা। দেখে মনে হল কোনও বিশাল বারোয়ারি পুজোর প্যান্ডেলে ভোগ খাওয়া হচ্ছে। আমরা ঠিক লাঞ্চের সময়ই অবশ্য পৌঁছলাম। লোক যেন গিজগিজ করছে। মাসটা আগস্ট বলে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি নামছে। কাদার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাঁচা মাটির ওপর বেশ কয়েকটা থান ইঁট পাতা, ইঁটগুলো অনায়াসে একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা করে নিয়েছে। সেই ইঁট ঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে মেক আপ রুম থেকে খাওয়ার প্যান্ডেলে লোকজন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সেলিব্রিটি অতিথি বা বিচারকরা অবশ্য যে যার নিজস্ব মেক আপ রুমের ঠান্ডাঘরে বসে রয়েছেন। অবশ্যই তাঁদের জন্য অন্য ব্যবস্থা। প্যান্ডেলের খাবার তারা খাবেনও না। যাই হোক মীরের গাড়িটা ইঁটের রাস্তার ওপর দিয়ে একেবারে মেক আপ রুমের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে শোরগোলটা যেন বেড়ে উঠল। "সর, সর, মীরদা এসেছে।" "ছাতাটা নিয়ে আয় মীরদা এসে গেছে।"

বৃষ্টির জল বাঁচিয়ে মীরকে নিয়ে যাওয়া হল ওর ঠান্ডা ঘরে। ঘরের দেওয়ালের রঙটা গোলাপি আর দেওয়ালের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে গোলাপি বিছানার চাদর এবং পর্দা। দেওয়ালে মীরাক্কেলের সেটে তোলা নানা পোজে মীরের ছবি। বিশাল একটা আলো দেওয়া আয়না। আর চৌকির পাশে একটা কাঠের বেঞ্চ। ঘরটায় ঢুকে কনকনে এসির ঠান্ডায় বাইরের প্যাচপ্যাচে ঘামটা শুকিয়ে গেল নিমেষে। ছাতার তলায় মাথা বাঁচিয়ে মীর ঢুকে পড়ল ওর সেই স্বপ্নের মঞ্চে। পৌঁছনো মাত্র শুরু হল একের পর এক লোকের দেখা করতে আসা। পোশাক নিয়ে একজন ঢুকলেন, অন্যজন চা। বাবাই নামের একটি ছেলে মীরকে ঘিরে ফেলল হঠাৎ করে চারপাশ থেকে। মীরের ব্যাগ, ফোন, সবকিছু চোখের নিমেষে নিজের জিম্মায় করে নিয়ে বাবাই বাড়তি লোকেদের ঘর থেকে হাটিয়ে দিল। আমি তখনও বেঞ্চের ওপর বসে মাটির ভাঁড়ে লেবু চায়ে চুমুক দিয়ে চলেছি। সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে, মীর এবার আমায় জিজ্ঞাসা করল, "খাবে না? এখানে ডিমের কারি আর ভাত পাবে।" বিদেশ থেকে কলকাতা গেলে প্রথম কয়েকদিন একটু নিয়ম মেনে না চললে, বাকি ট্রিপটা বেশ ভুগতে হয়। সুতরাং মীরের আতিথেয়তাকে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না আমার কাছে। ঘর থেকেই হাঁক পাড়ল মীর। "বাবাই, দিদি খাবে না রে।" সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে আর এক দল ছুটে এসে বলল, "দিদি, তাহলে স্যান্ডউইচ খান? এগ রোল? এনে দেব দিদি?" সত্যি কলকাতায় আহারের বাহার দেখে আমার মাঝে মাঝেই এই শহরটার

BanglaBook.org

প্রতি টান যেন আরও বেড়ে যায়। বিশেষ করে যখন প্রচণ্ড শীতে অফিস ক্যান্টিনে ঠান্ডা ব্যাগেলের মধ্যে ক্র্যাব স্যালাড দিয়ে চিবোতে হয়, তখন ফুচকা, আলুকাবলি, এগরোল, কাটলেট, কচুরি এইসবের জন্য প্রাণটা হু হু করে। কিন্তু কথায় আছে লোভে পাপ আর পাপের ফলশ্রুতি সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

আপাতত এই বইটি যতদিন না শেষ করে উঠতে পারছি ততদিন না হয় অমোঘ সেই পরিণতি দূরে সরিয়েই রাখা যাক। সুতরাং অত্যন্ত ভদ্রতার সুরে, লোভ সম্বরণ করে বললাম, "না ভাই আমি কিছু খাব না।"

মীর ততক্ষণে মুখের মেক আপ শুরু করেছে। মেক আপ শিল্পীকে নতুন আর কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। গত আট বছর ধরে এই সেটে কোনও মেকওভার ছাড়াই মীর নিজ মহিমায় বিরাজ করে। সেদিন কালো জামা আর প্যান্টের ওপরে পরতে হবে একটা বেগুনি জ্যাকেট। ফ্লোরের জুতো পালিশ করে রাখা হয়েছে তক্তপোশটির নীচে। আমি যখন ঘরের এদিক ওদিক দেখছি আর লেখার রসদ সংগ্রহ করছি, সেই সময়ে ঘরে ঢুকলেন মীরাক্কেলের পরিচালক শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। মীরের মেক আপ রুমে সেদিনই ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। ইংরিজি ভাষায় একটা শব্দ আছে 'কিউট'। শব্দটির সঙ্গে যদিও একটা নারীসুলভ ন্যাকামির গন্ধ জড়িয়ে এবং অচেনা কোনও খ্যাতনামা লোকের ওপর প্রয়োগ করা না গেলেও, ওঁকে দেখে কেন জানি না আমার প্রথম ওই কথাটাই মাথায় এসেছে। শান্ত, ধীর, স্থির, একটা হালকা আকাশি রঙের হাওয়াই শার্ট পরে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা, উনি ফ্লোর থেকে মেক আপ রুম, লাঞ্চ খাওয়ার প্যান্ডেল থেকে সেলিব্রিটির রুম, সবটাই তত্ত্বাবধান করে চলেছেন। সঙ্গে অগুনতি 'ভাই'-এর দল। তারাও তাদের শুভঙ্করদার নির্দেশে ছুটে চলেছে এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ওঁর সঙ্গে আলাপ করেই চেয়ে নিলাম ইন্টারভিউ করার সময়। শুটিং চলবে রাত দশটা অবধি। হয়তো বা আরও একটু বেশিক্ষণ। কিন্তু আমায় সময়টা বিকেল পাঁচটার মধ্যেই দিতে হবে। শুধু সেইটুকু জানিয়ে আমি ওঁকে অনুসরণ করে ফ্লোরে এসে দাঁড়ালাম।

এই সেই মঞ্চ, যেখান থেকে মীরের অনন্য পরিচয়। এই সেই মঞ্চ যেখান থেকে ওর পথচলতি মানুষের শিল্পী হয়ে ওঠা। কোথাও সাফল্য, কোথাও না পেরে ওঠার যন্ত্রণা, কোথাও গৌরব, সম্মান আবার কোথাও বা গ্লানি। হাজার হাজার অনুভূতি একসঙ্গে জড়ো হয়েছে এই মীরাক্কেলের আক্কেল চ্যালেঞ্জে।

BanglaBook.org

শুটিং তখনও অবশ্যই শুরু হয়নি। জোর কদমে ঠিক সময়ে শুটিং চালু করার জন্য লোকজন, সমস্ত ইউনিট তখন ব্যস্ত সমস্ত। শুভঙ্কর তখন ডিজিটাল বোর্ডের সামনে। সেখান থেকেই ফ্লোর মাইকে সকলকে নির্দেশ দিচ্ছেন। কেরোসিন দিয়ে কালো ফ্লোরটিকে শেষ মুহূর্তে আরও চকচকে করা হচ্ছে। বিচারকরা এসে পড়েছেন। কিন্তু তখনও আসন গ্রহণ করেননি। মোটামুটি সবাইকে আগামী এপিসোডগুলো ব্রিফ করে দেওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ মীর বেগুনি জ্যাকেট পরে কোথা থেকে এসে হাজির আমার সামনে। আমি তখনও ঠিক জানি না কোথায় বসব, কতক্ষণ থাকব। একটা দেড় ঘণ্টার এপিসোড শুট করতে এদের ঠিক কতক্ষণই বা লাগে, সেটাও আমার জানা নেই। সুতরাং বাড়ি ফেরার ব্যাপারটা নিয়ে বেশ চিন্তাই হচ্ছিল আমার। আর সেই সঙ্গে একটা এত বড় এন্টারটেনমেন্ট জগতের কর্মযজ্ঞের সাক্ষী হতে পেরে একটা অন্যরকম রোমাঞ্চও হচ্ছিল। একটা স্পটবয়কে ধরে এনে মীর আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, "দিদিকে নিয়ে গিয়ে বসা, দিদি আজ আমাদের অতিথি।" অতিথি শব্দটা শুনে আমিও যেন কেমন সম্বিত ফিরে পেলাম। হঠাৎ আমার মনটা কেমন যেন হু হু করে উঠল। একটা চেনা বিষাদ আমাকে আবারও ঘিরে ধরে মনে করিয়ে দিল আমি সত্যি এখন আমার শহরের অতিথি।

সেদিনের এপিসোডের প্রধান অতিথি তনুশ্রী। অভিনেত্রী তনুশ্রী ততক্ষণে ফ্লোরে পৌঁছে গিয়েছিল। যে সমস্ত চ্যালেঞ্জারের বাড়ির লোক সেদিন সেটে উপস্থিত, তারা অনেকেই তনুশ্রীর সই-এর জন্য উসখুস করছেন। আমি গিয়ে বসলাম একজন দর্শকের পাশে। তার বন্ধু মীরাক্কেলের কোন একটা সিজনের প্রতিযোগী, সুতরাং সেই সূত্র ধরে সে আজ মীরাক্কেলের এই এপিসোডের দর্শকের আসনটি অধিকার করেছেন। সেদিন সেটে 'বুনো হাঁস' নামক একটি বাংলা সিনেমার প্রচারের জন্য তনুশ্রী এসেছিল। সুতরাং তার সঙ্গেও ডিরেকটরিয়াল ব্রিফ সেশন চলল। অথচ যে এই পুরো শো-টাকে দেড় ঘণ্টা ধরে চালিয়ে নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে শুভঙ্কর একবারও কথা বললেন না। মীরের সঙ্গে কোনও স্ক্রিপ্টও আমার চোখে পড়েনি। সেই সকাল দশটা থেকে একবারও ওকে আমি স্ক্রিপ্ট উলটোতেও দেখিনি। তাহলে কি সমস্তটাই তাৎক্ষণিক? অসম্ভব! একটু পরেই অবশ্য সমস্ত কৌতূহলের অবসান ঘটল।

'আমরা তাহলে যাচ্ছি! স্টার্ট সাউন্ড, সাইলেন্স, রোল, রোলিং, চলো, যাচ্ছি, অ্যাকশন' — এই শব্দগুলো আজকাল সবার চেনা। আর সাংবাদিক হিসেবে

BanglaBook.org

আমার হয়তো আরেকটু বেশি ভালো করে চেনা। কিন্তু সেদিন শব্দগুলোতে যত না আমার শিহরণ জেগেছে, তার থেকে অনেক বেশি শিহরিত হয়েছি অন ক্যামেরা মীরের শো-এর ওপেনিং দেখে। সারাদিনের এত ব্যস্ততার পরেও পড়ন্ত বেলায় ক্যামেরার সামনে মীরের এপিসোড আরম্ভ করার উত্তেজনা দেখে। যেন হঠাৎ করে তাজা হয়ে উঠল মীর। এত ক্লান্তির মধ্যেও কী দারুণ প্রাণবন্ত শোনাচ্ছিল ওকে। বৃষ্টি ভেজা বাইরের মেঘলা দিনটা যেন এতক্ষণ স্টুডিওর ফ্লোরেও ছেয়ে গেছিল। এপিসোড শুরুতেই মীর এসে এক রাশ গলানো সোনার মতো রোদ্দুর ছড়িয়ে দিয়ে গেল। শুরু হল একের পর এক চ্যালেঞ্জারদের পারফরমেন্স। প্রত্যেকের প্রচেষ্টার কোনও তুলনা নেই। শেখানো হোক, গ্রুমড হোক, বার বার রিহার্সাল দিয়েও হোক, আমার সবসময় মনে হয়েছে যারা তাদের সহজাত স্বভাবের ছন্দে মানুষকে হাসাতে পারে, তারা সত্যি প্রত্যেকে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে। আমি অধীর ছিলাম অবশ্য মীর বিনা স্ক্রিপ্টে গোটা শোটিকে কীভাবে চালিয়ে নিয়ে যায়, সেটা দেখার জন্য। কথার পিঠে কথা সাজিয়ে, নানা রকম পান ব্যবহার করে সহজ হিউমার তৈরি করাটা মীরের জন্য নতুন কিছু নয়, কিন্তু অন ক্যামেরা ব্যান্ডেজের সঙ্গে গানগুলো? গানের সুরগুলো? সেগুলোও কি স্টেজের ওপর অন ক্যামেরা সিদ্ধান্ত নেয় ও? অবিশ্বাস্য মনে হলেও, সেটাই সত্যি। দু লাইন, চার লাইন, যাই হোক না কেন, পুরোটাই ওখানেই দাঁড়িয়ে, তাৎক্ষণিক। কথা, সুর, তাল, কথার সঙ্গে সুরের সঠিক গঠন পুরোটাই স্টেজে। সেদিন যদি শুটিং চলাকালীন আমি এই রহস্যটা জানতে পারতাম, তাহলে আমিও জি বাংলার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আরেকটু গলা ফাটিয়ে, প্রাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়ে বলতাম, "ভগবান অনেকক্ষণ ধরে, অনেক যত্নে এমন একজনকে তৈরি করেন।" কিন্তু মীরের এই অনস্টেজ গান বাঁধার গল্পটা আমি অনেক পরে রজতাভ দত্তের মুখে শুনেছি। আর শোনার পর থেকেই জায়গা খুঁজছি লোককে এসে বলার, যে মীরের মীরাক্কেল সত্যি মিরাকল্। এই জায়গায়, এমন মঞ্চে সব সম্ভব।

জীবনে কখনও এমন মুহূর্ত আসে, যখন কোনও কারণ ছাড়াই হাসি পায়। আমি মীরাক্কেলের শুটিং থেকে ফেরবার পথে গাড়িতে এমনভাবে অকারণে যে কতবার হেসে উঠেছি! পাশের গাড়ির চালক বা পেছনে বসে থাকা যাত্রীর সঙ্গে চোখে চোখ হওয়ায় হেসেছি, ফিরে এসে আমার চার বছরের মেয়েকে কোলে নিয়ে হঠাৎ অকারণে আদর করে হেসে উঠেছি, আরও কতবার, কত অকারণে। মীরাক্কেলে মীরের 'পাগলামি' যদি এমন করে

BanglaBook.org

রোজকার জীবনের সব গ্লানি মুছে ফেলে, এমন ভাবে সকলকে হাসাতে পারে, তাহলে আজ আমার বলতে ইচ্ছে করছে ধর্মতলার মোড়ে, শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায়, যেখানেই মানুষ ছুটে চলেছে প্রাত্যহিক জীবনের টানাপোড়েনে, সেখানেই শুটিং হোক মীরাক্কেলের।

সেদিনের এপিসোডটা পরে যখন এদেশে ফিরে এসে ইউ টিউবে দেখলাম টেলিকাস্ট হবার পরে, তখন অবশ্য সত্যি অন্য রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। 'এদেশে' মানে ইউরোপের পশ্চিমে নেদারল্যান্ডস্ নামক লো ল্যান্ডে, যে মুষ্টিমেয় বাঙালি আছেন, তাঁদের মধ্যে মীরাক্কেল নিয়ে প্রচুর তর্ক। একদল ভাবেন, ওই ধরনের টিভি প্রোগ্রাম পাতে দেবারই যোগ্য নয়। তাঁরা না বুঝে বাক্ বা মোৎজার্ট শোনেন। কলকাতা থেকে মোটা মোটা বাংলা সাহিত্যের বই কিনে এনে ঘর সাজান। বাংলা, ইংরাজি, ডাচ (আর তার সঙ্গে অন্য কোনও ইউরোপীয় ভাষা জানলে তো কথাই নেই) মিশিয়ে একটা জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলেন। তাঁদের কাছে মীরাক্কেল মানে 'ডাউন মার্কেট' একটা শো। 'এন আর আই স্ট্যাটাস'-এর লোক এরকম শো দেখলে নির্ঘাত জাত যাবে।

আর অন্যদল ভাবেন, এরকম 'কুল' শো কলকাতার প্রত্যেকটা চ্যানেলে কেন হয় না। এঁরা বাঙালির আড্ডায় চার পেগ হুইস্কি খেয়ে মীরাক্কেলের জোকস্ নিজেদের ভাণ্ডার থেকে এক-একটি অমূল্য রতনের মতো করে বের করে শোনান। এঁদের কাছে মীরাক্কেল মানে এক বুক অক্সিজেন। এই হাজার-হাজার মাইল দূরে থেকেও কলকাতার আর একটু কাছে যাওয়া।

আমি যে এপিসোডের শুটিং দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে মীর আমায় অন ক্যামেরা নিয়ে এসেছিল, সেটে এবং স্টেজে উঠে অতগুলো ক্যামেরার সামনে আমি বেশ থতমত খেয়ে কী বলব, না বলব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। পুরো ব্যাপারটাই 'হিট অফ দ্য মোমেন্ট', তাৎক্ষণিক। রোজ টিভি ক্যামেরার সামনে স্ক্রিপ্ট মুখস্থ বলার অভ্যাসটা অনেকদিন চলে গেছে। আর তখনও যে গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলতাম তাও তো না। মাঝে মধ্যেই 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' আলোচনার নিজস্ব গতি মেনে দু-একটা কথা এদিক-ওদিক বলতাম। 'ক্রিয়েটিভ লাইসেন্স' সাংবাদিকদের দেওয়াই থাকে কিছুটা। কিন্তু সে তো বহু যুগ আগের কথা। তখন আমার বয়সও কম। উদ্যমটাও অনেক বেশি। অবশ্য মীরাক্কেলে এসে বৃদ্ধা হয়ে গেছি, বয়স হয়েছে, এমন কথা বলাও অন্যায়। শুনেছি মীরাক্কেলে বার্ধক্যের কোনও জায়গা নেই। সবাই যেন নবীন, সবার যেন আনন্দের আতিশয্যে বয়স প্রায় কুড়ি বছর কমে যায়। এই চির নবীনের দলে আমার মতো অকালবার্ধ্যকে আক্রান্ত মানুষের ঠাঁই কী করে হল সেটা আজও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

BanglaBook.org

ইংরাজি, বাংলা, হিন্দি এতদিন ঠিক ছিল। কিন্তু এবারে জুটেছে ডাচটাও। আজকাল মাঝে মধ্যেই সহজ বাংলায় কথা বলতে বলতে, ডাচ শব্দ ঢুকে যায়। ইংরাজি তো ঠোঁটের আগায় লেগেই থাকে। বেশির ভাগ সময় ডাচ আর ইংরাজি বলতে বলতে বাংলাটা বলা প্রায় হয়েই ওঠে না। আর তাই সেদিন মাইক হাতে জ়ি বাংলার স্টেজে উঠে কথা বলতে গিয়ে কেমন যেন গলা কেঁপে উঠছিল। বার বার মনে হচ্ছিল, ভুল করেও যেন বাংলা শব্দ ভুলে না যাই। গোপাল ভাঁড়ের রসাগ্রাহীরা জানেন যে, কোনও প্রতিকূল অবস্থায় যদি কোনও ভাষা প্রথম মাথায় আসে, সেটা হল মাতৃভাষা। আর আমার মনের মধ্যে তখন মাতৃভাষা আর পিতৃভাষার লড়াই। যারা ভাবছেন যে আমার বাবা ইংরেজ বা ডাচ, তাঁরা ভুল ভাবছেন। অনেকদিন যাবৎ নেদারল্যান্ডস্-এ থাকার জন্য এই দেশটা আমার পিতৃভূমিসম প্রিয়, কাছের। সেরকমই আমি ভেবে নিয়েছি অন্তত। কারণ, শুনেছি কাছে না টানলে কোনও কিছুই কাছে আসে না। যাই হোক, মাইক হাতে স্টেজে উঠে গলা খাঁকরিয়ে মীরাক্কেল সম্পর্কে অনেক কিছু বলব ভাবলাম। কিন্তু পারলাম না। শুধু বললাম, "এই শোতে আমার জন্য একটাই উপহার। এমন একজন ভার্সেটাইল ট্যালেন্টকে, এমন হাসি, এমন ভাবে কলকাতাকে অত দূর থেকে দেখে উপভোগ করা। মীরাক্কেল হল্যান্ডে আমরা দেখি ইউ টিউবে। হয়তো কোনও উইকএন্ডে কোনও গ্যাদারিং-এ (অবশ্যই যেখানে আঁতলামি আর বাঙালির সংস্কৃতির চচ্চড়ি হয় না) কেউ একটা মীরাক্কেল সেশন খুলে বসে। সেখানে প্রধান আকর্ষণ মীর, আর তারপর পরের পর চ্যালেঞ্জাররা।" যখন মীরাক্কেল চলে, সেই সময়টুকু সবার চোখ টিভির পর্দায় এই দেশে ইন্টারনেট টিভির দৌলতে ইউ টিউব টিভিতেই চালানো যায়। সুতরাং গোটা কলকাতাটা সেই সময়টুকুর জন্য যেন আমাদের বসার ঘরে গমগম করে। অনেকেই মীরাক্কেলের জোক্স ইংরাজিতে অনুবাদ করে লাঞ্চ টাইমে বা কফি ব্রেকে টুপ করে একটি বোমা ফেলার মতো জোক্সটিকে ফেলে দেয় আন্তর্জাতিক জনতার সম্মুখে। সেখানে কপিরাইটের সত্যি কোনও বালাই নেই। কিন্তু সে না হয় মাফ করে দেওয়া যেতেই পারে। বিদেশী গান কপি করে যদি আমাদের বলিউড বুক ঠুকে এই ভাবে ফুলে ফেঁপে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে মীরাক্কেল তো কোন ছার।

অবশ্য অন স্টেজ আমি এত কথা বলিনি। তাহলে মীর আমায় যেমন আতিথেয়তা দেখিয়ে স্টেজে তুলেছিল, তেমন ভাবেই বলত — "এবার নামো, না হয় থামো। অনেক হয়েছে।"

সেদিন অন ক্যামেরা মীর একটা ডিগবাজি কম্পিটিশন করেছিল। যে যেখানে ছিল, অন্তত ১৫ কী ২০ জন তো হবেই, সবাই স্টেজে উঠে ডিগবাজি

BanglaBook.org

খাচ্ছে। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে, সেই এপিসোডটি যারা টিভির পর্দায় দেখেছিলেন, তাঁরা নিজেদের হাসি আটকে রাখতে পারেননি। যাঁরা প্রচণ্ড গম্ভীর, সংস্কৃতিপরায়ণ, তাঁরাও হয়তো ভাববেন, এটা চ্যানেলেরই দোষ। একটা প্রোডাকশনের পেছনে কম টাকা তো খরচ হয় না। হোক না বা নব্বই শতাংশ স্পনসর্ড। তবুও তো এতগুলো সময়। এত পরিশ্রম। সেটা কি ডিগবাজি খাওয়ার জন্য? ওয়াট আ চিপ হিউমার ইট ইজ!

সেদিন সেটে বসে ওই ডিগবাজি দেখে আমিও আমার হাসি আটকে রাখতে পারিনি। অবশ্যই কাউকে হঠাৎ করে ডিগবাজি খেতে দেখলে হাসি পাবার কথা নয়। কিন্তু মীরাক্কেল এখানেই বোধ হয় অনন্য। মাঝে মাঝে আমরা যখন ভালো মেজাজে থাকি, দেখেছি সবকিছু কেমন সুন্দর লাগে। অকারণে হাসিও পায়। তুচ্ছ কিছু একটা কারণে বেশ অনেকক্ষণ ধরে হেসে চলি আমরা। কোনও কারণ ছাড়াই। মীরাক্কেল দেখলে হাসির কারণ লাগে না। অকারণেই হাসি পায়। তাহলে কি সত্যি মীরাক্কেল মনকে ফুরফুরে করে রাখার ওষুধ? তরতাজা বা হালকা থাকার টনিক কি সত্যি চাইলে খুঁজে পাওয়া যায় মীরাক্কেলে? সেদিন সেটে বসে অবশ্য এত কিছু ভাবিনি। হাসতে হাসতে দম ফুরিয়ে গেছে। তখন আবার দম নিয়ে হাসতে শুরু করেছি। একবারও ভেবে দেখিনি, এত হাসছি কেন।

মীরাক্কেল দেখে শুধু একটা জিনিসই বুঝেছি, মীরাক্কেলে সর্বক্ষণ যেন হাসি আর আনন্দ তৈরি করা হচ্ছে। উপমাটা খুব বাজে হল জানি। ওলন্দাজদের দেশে থেকে থেকে আমার ভাবনাগুলো যেন ওদের মতোই হয়ে চলেছে। বৈষয়িক, প্র্যাকটিকাল! আর তাই সত্যি সেদিন মীরাক্কেলের সেটে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, প্রত্যেকটা মুহূর্ত মীরাক্কেল যেন 'হাসি' উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। এত বড় একটা কর্মকাণ্ডে, জীবনের প্রতিদিনের কঠিন যুদ্ধে, ঝড়ে জলে, রোদে পুড়ে সকলের একটাই উদ্দেশ্য, একটাই লক্ষ্য — মানুষ যেন হাসতে পারে। আর সেখানে কখনও যদি দু একটা 'ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট' ধরা পড়ে, তখন সেটাকে মেশিনের ভুল না ভেবে, মানুষের ভুল ভেবে উপেক্ষা করা উচিত।

মীরাক্কেলের গোটা টিমে যারা কাজ করেন, যাঁরা এই শো-টির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন, কখনও তাঁদের প্রতিদিনের জীবনের খোঁজ কেউ নিয়েছে? প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জারের চেষ্টা, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠ মনোযোগ — মানুষের স্বভাব, হাঁটা চলা, বলা, ওঠাবসা লক্ষ্য করে, সেগুলো নিয়ে ভাবা — এ তো অসীম সাধনার ব্যাপার। যাঁরা প্রতিদিনের চলার পথ থেকে হাসি কুড়িয়ে নিয়ে মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন, তাঁদের মতো সুখী

BanglaBook.org

আর হয়তো কেউ হয় না। জোক্স-এর গুণমান কখনও মার্জিত, কখনও অমার্জিত। কিন্তু যখন মাত্রা নির্বাচনের সময় আসবে, তখনই বা শুধু মীরাক্কেল কেন? বালউডের আইটেম সং, সেখানে তারকাদের পোশাক, গানের ভাষা, নাচের ভঙ্গী — এগুলোর ওপরে মাত্রা-বিচারের নিষেধাজ্ঞা নেই কেন তাহলে?

দূরে থাকি বলেই বোধ হয় আমাদের স্বভাবজাত আত্মপ্রবঞ্চনা বা হিপোক্রেসিটা নিয়ে সহজে লেখার সাহস জোটাতে পেরেছি। মীরাক্কেলের সেট থেকে বেরিয়ে যখন বাড়ি ফিরছি, অন্য আরেকজন সাংবাদিক বন্ধুর ফোন পেলাম রাস্তায়। তখনও আমার ঘোর কাটেনি। অন্য সময় হলে অত উচ্ছ্বসিত হয়ে ফোন ধরতাম কিনা জানি না, কিন্তু ওই একটা ঘোরের মধ্যে বলেই হয়তো অকারণ উচ্ছ্বাসে ফোনটা রিসিভ করলাম। "কী রে কোথায়?" অন্য দিক থেকে বেশ একটা কৌতূহলের সুর। আমি এক গাল হেসে বলে উঠলাম, "মীরাক্কেল থেকে ফিরছি। শুটিং দেখতে গিয়েছিলাম।"

"মীরাক্কেলের শুটিং? মীরাক্কেলের সাইটে গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ রে! মীরাক্কেলের শুটিং স্পটে নিশ্চয় মহাভারতের শুটিং দেখতে যাব না।"

"হুম!" উত্তরটা মনঃপূত হয়নি আমার বন্ধুর। তাই অদ্ভুত একটা শ্লেষ মিশিয়ে বলল, "কেমন লাগল? এনজয় করলি?"

আমি ওর কথাটা শেষ হওয়ার আগেই বললাম, "দারুণ। এনজয় করব না? এমন একটা শো এনজয় না করে উপায় আছে? শুধু হেসেছি।"

অপরদিক থেকে আমার বন্ধু বলে উঠল, "ডাচ সেন্স অফ হিউমার কেমন আমার জানা নেই। তবে, মীরাক্কেল-ফেরৎ তুই, তোর সেন্স অফ হিউমারের কী হল সেটাই ভাবছি। তুই সত্যি হেসেছিস! ওই হিউমারটায় হাসি পায়? বেশ চিপ হিউমার বলে মনে হয়নি? কখনও তো জোর করেও হাসানো!"

বোধ হয় এবার সরব হওয়ার পালা এসেছিল। অবশ্যই কারুর নিজস্ব চিন্তাধারা পালটে দিয়ে তার ওপর কোনও কিছু চাপিয়ে দেবার মতো বিপ্লবী আমি নই। তবুও চুপ করেও যেন থাকতে পারলাম না। বেশ একটা কড়া গলায় বললাম, "তোমাদের সেন্স অফ হিউমার নিয়েও আমার বেশ রিজার্ভেশন আছে। ওয়াই কান্ট ইউ এপ্রিসিয়েট দ্য এফোর্ট। আর প্রোটেকস্ কোনটা, সেটা বোধ হয় দেখার ওপর নির্ভর করে। জানার ওপরে নির্ভর করে। যখন করণ জোহর প্রত্যেকটা কথায় পান ব্যবহার করে লোক হাসায়, তখন সেটা চিপ লাগে না কেন বল তো?" আলোচনাটা বেশ উত্তপ্ত হতে হতে ঝগড়ার পর্যায়ে যখন যেতে চলেছে, তখন হঠাৎ আমার ফোনে আর একটা কল

BanglaBook.org

ওয়েটিং দেখাল। আমি তাই সেই সময়ের জন্য আলোচনাটা তুলে রেখে অন্য ফোনটা ধরে বললাম, "হ্যাঁ, মীর বলো?"

"পৌঁছচ্ছো?"

আমি বললাম, "না গো! জ্যাম। বাট আর বেশি দেরি নেই। তোমাদের শুটিং কতদূর?" পরের দিনের এপিসোড শুট হবে, এটাই ছিল সেদিনের সেডিউলে। সুতরাং সেই নির্ঘণ্ট মেনে শুটিং চলবে আরও বেশ খানিকক্ষণ। তার মাঝেই আমার ঠিকঠাক ভাবে পৌঁছনোর খবরটুকু পাবার জন্য ফোন করেছে মীর। দীর্ঘ আঠারো ঘণ্টা টানা কাজ করার পরেও ক্লান্তি যেন মীরের আশেপাশেও আসে না। তার মধ্যেও নিজের কর্তব্য করে চলে মীর। একটা মাথার মধ্যে এতকিছু একসঙ্গে বহন করে নিয়ে চলা! সবসময় হাসি, সবসময় যেন উপরের দিকে এগিয়ে চলার অদম্য প্রয়াস। সব বাধাকে জয় করবার শক্তি যেন ওর শরীর আর মন জুড়ে।

এই ইচ্ছেশক্তির জোরেই এতখানি পথ অতিক্রম।

মীর তোমার ইচ্ছেশক্তিকে সেলাম। তোমায় সেলাম!

পাঁচ

মীরাক্কেলের শুটিং স্পটেই কথা হল রজতাভ দত্তের সঙ্গে। মীরের আরেক গুণমুগ্ধ বলা চলে। তিনি নিজে যেমন অনবদ্য একজন অভিনেতা, তেমনই অসাধারণ একজন মানুষ। টিভির পর্দায় তিনি অবশ্য এখন 'রনিদা' নামেই বেশি খ্যাত। রজতাভ থেকে রনি হতে তার সত্যি কোনও সময় লাগেনি। মানুষটির সঙ্গে কথা বললে সেটা বোঝা যায়। এরকম মাটির মানুষ বা ইংরাজিতে বললে 'ডাউন টু আর্থ' মানুষ এই প্রজন্মে খুব কম দেখা যায়। নেতিবাচক চরিত্রের ভিড়ে আসল রনিদাকে আপাতদৃষ্টিতে বেশ গম্ভীর এবং স্বল্পভাষী মনে হলেও কথার পিঠে কথা সাজিয়ে তিনি কিন্তু প্রচুর আড্ডা দিতে পারেন। এবং সেদিন এই বই লেখার সূত্রে, মীরাক্কেল এবং মীর নিয়ে প্রচুর অজানা তথ্যও তুলে ধরলেন রনিদা আমার সামনে।

"মীরের সঙ্গে টানা সাত বছর সপ্তাহে চারদিন দিবারাত্র কাজ করেছি। ও আমার একজন খুব কাছের লোক। এতগুলো বছর একসঙ্গে প্রতিদিন কাজ করায় কলিগ নয়, ওর সঙ্গে আত্মীয়তা জন্মে গেছে। মীরের একটা অন্য রকম রসবোধ। ওর সঙ্গে এমনি সাধারণ কিছু নিয়ে কথা বলতে বলতে ও তার মধ্যে হিউমার খুঁজে বের করে ফেলে। কিছু না হলেও হয়তো আমায় খানিকটা

BanglaBook.org

নকল করে সেই মুহূর্তে একটা হাসির সিচ্যুয়েশন ক্রিয়েট করে। এত সহজ, এমন স্পন্টেনিয়াস, মাথায় চিন্তা আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে কথায় সাজিয়ে ফেলতে পারে মীর। একজন অ্যাঙ্কর হিসেবে মীর মূলত ব্যাঙ্ক করে ওর বুদ্ধির ওপরে। উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করে উপায় নেই। আর তার সঙ্গে রয়েছে ওর গান বাঁধার ক্ষমতা। আগেকার দিনে তর্জা গানে যেমন কথার সূত্র ধরে সুরে ঢুকে যেত কবিয়ালরা, মীর যেন ঠিক সেইরকমই। ওর পুরোটাই শুনতে শুনতে শেখা। তার ওপরে ভাষার দখল তো আছেই। হিন্দি, বাংলা, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষায় মীর খুব স্ট্রং। সুতরাং শুনে শুনে, ক্রস রেফারেন্স করে, এমন ভাবে সেটাকে ও উপস্থাপনা করে সেটা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে কুলিয়ে ওঠে না। মীরের কাছে আসার পরে আরও যে দিকটা আমার ভালো লাগে, সেটা হল ওর মধ্যের মানবিক সত্তাটা। ওর অ্যাঙ্কর হিসেবে, দেখার একটা অন্য চোখ তো আছেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আছে বোঝবার বা ভাববার একটা নরম কোমল মন। শিশুর মতো সরল। কলকাতার বিভিন্ন এন জি ও-তে মীর গোপনে হেল্প করে। কেউ জানতেও পারে না কখনও। ওর মেয়ে মুসকানের জন্মদিনে যে সমস্ত খেলনা উপহার পায়, তার অর্ধেক খেলনা চলে যায় শহরের নানা এন জি ও তে, নানা শিশুদের হাসপাতালে। শহরের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব হিসেবে কোনদিনও তার প্রচার হতে দেয়নি মীর। এর থেকেই বোঝা যায়, মীরের এই দান নিছক নাম বা প্রতিষ্ঠার জন্য নয়।"

মীরকে নিয়ে বলতে বলতে রনিদা, সেদিন বেশ উদাস হয়ে গিয়েছিলেন। বেশ স্পর্শকাতর একটা জায়গায় বিরাজ করে মীর। রনিদার পরের কথাগুলো শুনে মীরের একজন গুণমুগ্ধ হিসাবে তাই আমারও সেদিন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। "নট ফর দ্য সেক অফ পাবলিসিটি অবশ্যই," রনিদা সেদিন বলেছিলেন, "মীরকে মানুষ হিসেবে আমি শ্রদ্ধা করি। মীর একজন প্রবাদপ্রতিম অ্যাঙ্কর। মীর ইজ আ মিথ, ওকে এই জেনারেশনে কেউ চিনবে না হয়তো। ওর ক্ষমতা কতটা সেটা জানবে আগামী প্রজন্ম।"

এই বইয়ের সূত্র ধরে এমন অনেক গুণী মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি আমি। আর জেনেছি মীরকে ওঁদের মতো করে। দর্শক হিসেবে হোক, ফ্যান হিসেবে হোক, হয়তো বা কখনও বন্ধু হিসেবেও যে মীরকে আমি চিনতাম, জানতাম, কলকাতার প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের মাঝেও মীর সেই একই রকম। ওর সঙ্গে সহজ ভাবে মেশা যায়। অল্প সময়ে বন্ধুত্ব করে নেওয়া যায়। একজন খুব সহজ স্বাভাবিক মানুষ। যাঁদের মনে মনে শ্রদ্ধা করে এসেছি, তাঁরা যখন চোখের সামনে, ভিড়ের মাঝে আমার সামনে এসে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়েছে, সাংবাদিক ব্যক্তিসত্তার বাইরে বেরিয়ে প্রতিক্রিয়া জাহির করতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু মনে মনে একটা উত্তেজনা অনুভব করেছি। মনে হয়েছে আকাশ থেকে হঠাৎ করে একটা তারা খসে পড়েছে। ছুঁতে পারিনি। দূর থেকে তাকিয়ে থেকেছি। মুগ্ধ হয়েছি। আর আমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়েছে। কিন্তু মীরের সঙ্গে যতবার ওঠা বসা করেছি, আমার মনে হয়েছে ওর মতো সহজ সুরে, অবলীলায় আর কোনও সেলিব্রিটি আপন করে নেননি। আর সেটা শুধু আমি সাংবাদিক বলে নয়। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা সচরাচর সব রেস্তোরাঁয়, কফিশপে, অনেক ভিড়ের মধ্যে নিজেকে সামনে আনতে চান না। কিন্তু মীরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য যতবার দেখা করেছি, সবসময় সেটা হয়তো বা শপিং মলে, শহরের সবচেয়ে জনবহুল জায়গা যেটি বা অন্য কোনও নাম-না-জানা কফিশপে। ওকে বারবার জিজ্ঞেস করেছি, "এমন একটা জায়গায় সাক্ষাৎকার দেবে, তুমি মবড্ হবে না?" মীর হেসে বলেছে, "নাঃ, আমার অসুবিধা হয় না"।

মীরের 'ফ্যান ফলোয়িং' যে কী বিশাল, সেটা ওর সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় নামলে বোঝা যায়। রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসা মাত্র, ক্যামেরা, কাগজ পেনসিল, মোবাইল ফোন আর কিছু না হলে রেস্তোরাঁর টেবিলের ওপর পড়ে থাকা টিস্যু নিয়ে মীরের টেবিলের সামনে ভিড় করে মানুষ। আজ অবধি কখনও কাউকে মীর নিরাশ করেনি। রেস্তোরাঁর মালিক, ওয়েটার, এমনকী কখনও কখনও কুক এসেও ওর সঙ্গে ছবি তুলে গেছে। সবার সঙ্গে সমান পোজে, সমানভাবে সম্মান দিয়ে মীর ছবি তুলেছে বা অটোগ্রাফ দিয়েছে। এরকম পাবলিক প্লেসে পপুলারিটি পরখ হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ — এটা ঠিকই। কিন্তু মীরকে দেখে কখনও মনে হয় না যে, ও সেগুলো নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়। কখনও জনতার সামনে, ভিড়ের মাঝে ওকে অন্য রকম হয়ে যেতে দেখিনি। সেলিব্রিটি হিসেবে কোথাও একটু বেশি খাতির পেলে বরং কেমন যেন গুটিয়ে গেছে মীর। প্রোগ্রাম চলাকালীন, কোনও অডিটোরিয়ামে স্টেজ থেকে নীচে নেমে এসে বৃদ্ধ মানুষকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেছে মীর। অনস্ক্রিন ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েও দেখেছি বৃদ্ধ দর্শককে প্রণাম করতে। আমাদের জীবন থেকে এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলো ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভালো লাগে এত দ্রুত এগিয়ে এসেও মীর পেছনে ফিরে তাকাতে জানে। আর একসঙ্গে সবাইকে নিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে জানে। ওটা ওর স্বভাবজাত। আলাদা করে কিছু করতে হয় না। সবার সঙ্গে থাকতেই ও বেশি ভালোবাসে — সবাইকে নিয়ে, সবার কথা ভেবে। তাই কারণে-অকারণে সবাইকে কাছেও টেনে নিয়ে আসতে পারে। দুহাত খুলে প্রাণ ভরে মানুষকে

BanglaBook.org

দিতে পারে। ঈদের সময় সমগ্র জ়ি বাংলার মীরাক্কেলের টিম, প্রায় ২৫০ জন তো হবেই, সবাইকে পেটপুরে খাওয়াতে পারে। নিশ্চুপে অনাথালয়ে গিয়ে সবার অলক্ষে চোখের জল মুছে অবোধ শিশুগুলোকে কোলে তুলে নিয়ে তাদের সুস্থ ভবিষ্যতের আশ্বাসও দিতে পারে অনায়াসে। আর যখন প্রশ্ন করে কেউ, "তুমি কেমন করে এত সহজ হয়ে যাও সকলের সঙ্গে?" তখন নির্দ্বিধায় বলে ওঠে মীর, "সাধারণের সঙ্গে না থাকলে, রসদ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ওখানেই তো সবটা পাওয়া যায়।" কলকাতার রাস্তায় যে হাসির রসদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেটা কলকাতায় মীরের সঙ্গে না ঘুরলে হয়তো বা আমার কোনওদিনও জানাও হত না। আমি আগেও বলেছি ওর মতো এই শহরটাকে হয়তো আর কেউ এত কাছ থেকে দেখে না। সুযোগ থাকলেও দেখে না বা হয়তো দেখলেও সেখান থেকে এমন করে হাস্যরস মন্থন করার মতো মনন কারুর নেই। শহরের রূপ, রস, গন্ধ, ভিড়, আবর্জনা, পথের ধারের প্লাস্টিকের ঘর, পাশের বহুতল, লাল সবুজ মিছিল, এগুলো দৈনন্দিন চিত্র। কলকাতার কালোবাজারি, চুরি, লোক ঠকানো আর এগুলোর জন্য সরব প্রতিবাদও যেন কেমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে এই শহরের সঙ্গে। রাজনীতির নাগপাশে জড়িয়ে, কোথায় বিকাশ, কোথায় অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, তার হিসেব মেলাতেই সাধারণ মানুষ ক্লান্ত। কিন্তু এর মধ্যে মীর কোথা থেকে যে আনন্দ কুড়িয়ে পায়, সে কথা যতবার ভাবি, নতুন উদ্যমে যেন বাঁচতে ইচ্ছে করে। সত্যি পুলক লাগে। অজানা রোমাঞ্চে মনটা কেমন হালকা হয়ে যায়। ভাবতে ভালো লাগে যে, এমন একজন আশাবাদী আলোকময় মানুষের কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছি। একটা সাদা-কালোর জীবনে, অসম্ভব পরিশ্রান্ত জীবনের ঘূর্ণিপাকে কীভাবে সহজ সুরে সব গ্লানিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া যায়, সেটা মীরের থেকে কেউ ভালো জানে না। এমন মানুষ জীবনে সত্যি সুখী। প্রকৃত অর্থে সুখী। আজ লিখতে লিখতে আরেকবার তাই প্রার্থনা করে যাই, আমার সকল পাঠকবন্ধুদের নিয়ে চিরকাল এমনই করে হেসে আর ভালো থেকে কাটিয়ে দাও। জীবনে সুন্দরকে এনে দেওয়ার জন্য, তোমায় মন থেকে ধন্যবাদ মীর।

BanglaBook.org

ছয়

অভিনয় ক্ষমতাটা মীরের মজ্জাগত। না, অবশ্যই সেটা বংশসূত্রে পাওয়া নয়। ওর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসম্ভব ভালো। আর তাই মানুষকে শুধু দেখে ও তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি নকল করে নিতে পারে এবং সেটা ওর স্বভাবজাত

ক্ষমতায় ফুটিয়েও তুলতে পারে চোখে মুখে। তবে এর তালিমটা শুনেছিলাম বহুদিন আগে থেকে পাওয়া।

আজিমগঞ্জে ছুটির সময় যখন দাদুর বাড়ি যেত, সেখানে অবাধে ছুটির মেজাজে মীর তার অবসর সময় কাটাত। কখনও গল্প বলে, শহরের কথা বলে, কখনও গল্প শুনে। আর গল্পের আদান প্রদানে মীরের একমাত্র সঙ্গী ছিলেন ওর দাদু।

"ছোট্টবেলায়, স্কুলে থাকাকালীন ছুটি মানেই গ্রামের বাড়িতে যাওয়া। শীতের সময় হোক, বা গরমের সময় হোক, মাটির দাওয়ায় মাদুর পেতে আমাদের আড্ডা বসত। কখনও মুড়ি বা সঙ্গে বাদাম। শীতের সময় রোদের আঁচে, দুপুরের ঘুমটাকে বেশ আড্ডা গল্প হৈ-চৈ করে এড়িয়ে যাওয়া যেত। আর গরমকালে তো কথাই নেই। গাছের ছায়া দেখে মাদুর পেতে আমের ঝুড়ি নিয়ে একসঙ্গে বসা। সে সময় গ্রামের বাড়িতেই দাদুর কাছে রেডিও ছিল। দুপুরবেলা বসত গল্পদাদুর আসর। আমি একাগ্র হয়ে দাদুর সঙ্গে বসে প্রত্যেকটা গল্প শুনতাম। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। গল্প শেষ হয়ে যেত। রেডিও বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু গল্পগুলোর রেশ কাটত না। তারপর গোটা দিনটাই প্রায় রেডিওর ওই গল্পগুলো আমায় হন্ট করে বেড়াত। দাদু আমায় চুপচাপ বসিয়ে রাখার জন্য ওই গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন। কখনও চরিত্রের বিশ্লেষণ, কখনও বা ঘটনার বিবরণ। আর সব শেষে বলতেন, এবার তুই আমায় গল্পগুলো বল তো দেখি। আমিও শুরু করতাম। বেশ নাটকীয় ভাবে। কখনও আমি নিজেই একটা চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতে শুরু করতাম। অভিনয় করতে করতে গল্পটা ন্যারেট করতাম। আবার দাদু কখনও আরও কঠিন টাস্ক দিতেন আমায়। বল তো দাদু, এই গল্পটা তুলসী চক্রবর্তীর মতো করে বা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো করে। আর আমি তখন প্রাণপণ লড়ে চলেছি। মাথার মধ্যে এই ক্যারেকটারগুলো গেঁথে আছে। নিজেকে তখন একটা অন্য মোডে নিয়ে গেছি। চোখ বন্ধ করলে ওঁরা তখন আমার সামনে। আমি অবিকল গলা কপি করে ওঁদের মতো হাঁটছি, কথা বলছি। কখনও পারফেকশন বা অ্যাকিয়্যুরেট হল কিনা ভাবিনি। জাস্ট চোখ বন্ধ করে কপি করে গেছি। একটু এদিক ওদিক যখন হয়েছে, দাদু আমায় ঠিক করে দিয়েছেন। মিমিক্রি করাটা একটা আর্ট — এটা দাদুর কাছে শেখা।

"আমার ওইসব অভিনব কাণ্ড কারখানা আমাদের গ্রামের দিনগুলো, ছুটির মেজাজ এগুলোকে যেন আরও সজীব রাখত। আব্বা আর মা যেন তখন আমায় নিয়ে মশগুল। পৃথিবীর আর কোনও দুঃখ, কোনও কষ্ট যেন ওই মুহূর্তগুলোয় আব্বা আর মা-র ধারে কাছেও আসতে পারত না।

BanglaBook.org

দিতে পারে। ঈদের সময় সমগ্র জ়ি বাংলার মীরাক্কেলের টিম, প্রায় ২৫০ জন তো হবেই, সবাইকে পেটপুরে খাওয়াতে পারে। নিশ্চুপে অনাথালয়ে গিয়ে সবার অলক্ষে চোখের জল মুছে অবোধ শিশুগুলোকে কোলে তুলে নিয়ে তাদের সুস্থ ভবিষ্যতের আশ্বাসও দিতে পারে অনায়াসে। আর যখন প্রশ্ন করে কেউ, "তুমি কেমন করে এত সহজ হয়ে যাও সকলের সঙ্গে?" তখন নির্দ্বিধায় বলে ওঠে মীর, "সাধারণের সঙ্গে না থাকলে, রসদ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ওখানেই তো সবটা পাওয়া যায়।" কলকাতার রাস্তায় যে হাসির রসদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেটা কলকাতায় মীরের সঙ্গে না ঘুরলে হয়তো বা আমার কোনওদিনও জানাও হত না। আমি আগেও বলেছি ওর মতো এই শহরটাকে হয়তো আর কেউ এত কাছ থেকে দেখে না। সুযোগ থাকলেও দেখে না বা হয়তো দেখলেও সেখান থেকে এমন করে হাস্যরস মন্থন করার মতো মনন কারুর নেই। শহরের রূপ, রস, গন্ধ, ভিড়, আবর্জনা, পথের ধারের প্লাস্টিকের ঘর, পাশের বহুতল, লাল সবুজ মিছিল, এগুলো দৈনন্দিন চিত্র। কলকাতার কালোবাজারি, চুরি, লোক ঠকানো আর এগুলোর জন্য সরব প্রতিবাদও যেন কেমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে এই শহরের সঙ্গে। রাজনীতির নাগপাশে জড়িয়ে, কোথায় বিকাশ, কোথায় অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, তার হিসেব মেলাতেই সাধারণ মানুষ ক্লান্ত। কিন্তু এর মধ্যে মীর কোথা থেকে যে আনন্দ কুড়িয়ে পায়, সে কথা যতবার ভাবি, নতুন উদ্যমে যেন বাঁচতে ইচ্ছে করে। সত্যি পুলক লাগে। অজানা রোমাঞ্চে মনটা কেমন হালকা হয়ে যায়। ভাবতে ভালো লাগে যে, এমন একজন আশাবাদী আলোকময় মানুষের কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছি। একটা সাদা-কালোর জীবনে, অসম্ভব পরিশ্রান্ত জীবনের ঘূর্ণিপাকে কীভাবে সহজ সুরে সব গ্লানিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া যায়, সেটা মীরের থেকে কেউ ভালো জানে না। এমন মানুষ জীবনে সত্যি সুখী। প্রকৃত অর্থে সুখী। আজ লিখতে লিখতে আরেকবার তাই প্রার্থনা করে যাই, আমার সকল পাঠকবন্ধুদের নিয়ে, চিরকাল এমনই করে হেসে আর ভালো থেকে কাটিয়ে দাও। জীবনে সুন্দরকে এনে দেওয়ার জন্য, তোমায় মন থেকে ধন্যবাদ মীর।

BanglaBook.org

ছয়

অভিনয় ক্ষমতাটা মীরের মজ্জাগত। না, অবশ্যই সেটা বংশসূত্রে পাওয়া নয়। ওর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসম্ভব ভালো। আর তাই মানুষকে শুধু দেখে ও তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি নকল করে নিতে পারে এবং সেটা ওর স্বভাবজাত

ক্ষমতায় ফুটিয়েও তুলতে পারে চোখে মুখে। তবে এর তালিমটা শুনেছিলাম বহুদিন আগে থেকে পাওয়া।

আজিমগঞ্জে ছুটির সময় যখন দাদুর বাড়ি যেত, সেখানে অবাধে ছুটির মেজাজে মীর তার অবসর সময় কাটাত। কখনও গল্প বলে, শহরের কথা বলে, কখনও গল্প শুনে। আর গল্পের আদান প্রদানে মীরের একমাত্র সঙ্গী ছিলেন ওর দাদু।

"ছোট্টবেলায়, স্কুলে থাকাকালীন ছুটি মানেই গ্রামের বাড়িতে যাওয়া। শীতের সময় হোক, বা গরমের সময় হোক, মাটির দাওয়ায় মাদুর পেতে আমাদের আড্ডা বসত। কখনও মুড়ি বা সঙ্গে বাদাম। শীতের সময় রোদের আঁচে, দুপুরের ঘুমটাকে বেশ আড্ডা গল্প হৈ-চৈ করে এড়িয়ে যাওয়া যেত। আর গরমকালে তো কথাই নেই। গাছের ছায়া দেখে মাদুর পেতে আমের ঝুড়ি নিয়ে একসঙ্গে বসা। সে সময় গ্রামের বাড়িতেই দাদুর কাছে রেডিও ছিল। দুপুরবেলা বসত গল্পদাদুর আসর। আমি একাগ্র হয়ে দাদুর সঙ্গে বসে প্রত্যেকটা গল্প শুনতাম। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। গল্প শেষ হয়ে যেত। রেডিও বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু গল্পগুলোর রেশ কাটত না। তারপর গোটা দিনটাই প্রায় রেডিওর ওই গল্পগুলো আমায় হন্ট করে বেড়াত। দাদু আমায় চুপচাপ বসিয়ে রাখার জন্য ওই গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন। কখনও চরিত্রের বিশ্লেষণ, কখনও বা ঘটনার বিবরণ। আর সব শেষে বলতেন, এবার তুই আমায় গল্পগুলো বল তো দেখি। আমিও শুরু করতাম। বেশ নাটকীয় ভাবে। কখনও আমি নিজেই একটা চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতে শুরু করতাম। অভিনয় করতে করতে গল্পটা ন্যারেট করতাম। আবার দাদু কখনও আরও কঠিন টাস্ক দিতেন আমায়। বল তো দাদু, এই গল্পটা তুলসী চক্রবর্তীর মতো করে বা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো করে। আর আমি তখন প্রাণপণ লড়ে চলেছি। মাথার মধ্যে এই ক্যারেকটারগুলো গেঁথে আছে। নিজেকে তখন একটা অন্য মোডে নিয়ে গেছি। চোখ বন্ধ করলে ওঁরা তখন আমার সামনে। আমি অবিকল গলা কপি করে ওঁদের মতো হাঁটছি, কথা বলছি। কখনও পারফেকশন বা অ্যাকিয়্যুরেট হল কিনা ভাবিনি। জাস্ট চোখ বন্ধ করে কপি করে গেছি। একটু এদিক ওদিক যখন হয়েছে, দাদু আমায় ঠিক করে দিয়েছেন। মিমিক্রি করাটা একটা আর্ট — এটা দাদুর কাছে শেখা।

"আমার ওইসব অভিনব কাণ্ড কারখানা আমাদের গ্রামের দিনগুলো, ছুটির মেজাজ এগুলোকে যেন আরও সজীব রাখত। আব্বা আর মা যেন তখন আমায় নিয়ে মশগুল। পৃথিবীর আর কোনও দুঃখ, কোনও কষ্ট যেন ওই মুহূর্তগুলোয় আব্বা আর মা-র ধারে কাছেও আসতে পারত না।

BanglaBook.org

আমি সেদিনই হয়তো শিখেছিলাম মানুষকে হাসতে শেখানোর ম্যাজিকটা। মনখারাপ ব্যাপারটা, গম্ভীর হয়ে জীবন কাটানোর পক্ষে আমি ছোটবেলা থেকেই ছিলাম না। আর তাই হয়তো নিজের অজান্তেই কখন যেন মানুষকে হাসাতে শুরু করলাম, নিজেও একবারও টের পেলাম না। লোককে হাসিয়ে যে এত আনন্দ, এত তৃপ্তি এটা কোনদিনও ভাবিনি। যখন দেখলাম যে, আমার ছেলেমানুষিগুলোই লোকের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন বুঝলাম এই স্কিলগুলোকে আরও ব্রাশ করা দরকার। আজ আমি যা, তার খানিকটা যেমন দাদুর দেওয়া, তেমনই খানিকটা সময়, সময়ের উপলব্ধি থেকেও পাওয়া। ছোটবেলার দিনগুলো আমায় অনেক কিছু শিখিয়েছে। কলকাতার ওইরকম প্রাত্যহিক যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে কাটাতে আব্বা আর মা যেন ক্রমশ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন। আমার ওই হাসি ঠাট্টাগুলো যেন তাঁদের মধ্যে বেঁচে থাকবার অনুপ্রেরণা দিত। সত্যি চ্যারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম। আমারও সেই শিশু বয়স থেকেই শুরু। আজও হ্যাবিটটা ছাড়তে পারিনি। হয়তো তাই নিজেও এত আনন্দে থাকি।"

মানুষকে দেওয়ার মতো পার্থিব জিনিসের শেষ নেই। হাতে যদি খরচ করবার মতো টাকা থাকে, তাহলে দুর্লভ বহুমূল্য জিনিসও এনে হাজির করা যায় অনায়াসে। কিন্তু মীর যেমন ভাবে দুহাত ভরে বিতরণ করে চলেছে আনন্দ আর হাসি, তেমনটা সত্যি হয়তো সবার পক্ষে করা অসম্ভব।

মাঝে মাঝে ভাবি, কোন মীরের প্রশংসা করব। যে মীর সহজে হাসাতে পারে, যে মীর উইটি, নাকি যে মীর অসাধারণ অভিনয় করে, নাকি যে মীর গান লেখে, না সেই মীর, যে গান গেয়ে হাজার হাজার জনতার মন জয় করে। আবার সেই মীরকেও প্রশংসা করতে ইচ্ছে করে যে দিনের আরম্ভে ঘুম থেকে তুলে 'হাই কলকাতা' বলে ওঠে। টেলিভিশনের মীর, রেডিওর মীর, মঞ্চের মীর, রুপোলি পর্দার মীর। 'জ্যাক অফ অল ট্রেডস' আবার 'মাস্টার'ও বটে। আমাদের দেশে, বিশেষ করে কলকাতায় গুণী মানুষের অভাব নেই। তর্কের খাতিরে দেখতে গেলে লোকজন বলতেই পারে, এমন গুণ কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সবাই এমন প্রচারের আলোয় আসে না, তাই। 'হি ইজ লাকি টু বি অন দ্য গেম'। খতিয়ে দেখলে সেটাও সত্যি। টিকে থাকার জন্য যে মনের জোর আর সাহস লাগে, সেটা মীরের চিরকাল ছিল। ২০০৪ সালে গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জে প্রথম দশজনের মধ্যে এসেও মীর সপ্তম স্থানে আটকে যায়। প্রথম ছ জনের মধ্যে প্রবেশপত্র না পাওয়ায় খেলাটা সেই সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গেলেও চ্যালেঞ্জটা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। গ্রেট

BanglaBook.org

ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, মানুষ তাঁকেই শুধু মনে রেখেছে। পরের পাঁচ জন চ্যালেঞ্জারকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। জাতীয় মঞ্চে না হোক, মীর কিন্তু প্রথম না হয়েও প্রথম থেকে গেছে আজও। প্রশংসা কুড়িয়ে পাওয়ার জায়গাটা করে নিয়েছে ও নিজে। মীর জীবনে হাল ছেড়ে দিতে শেখেনি। একটা দরজা বন্ধ হলে অন্য দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে। অধ্যবসায়, সাধনা, পরিশ্রম, জেদ, স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা — কোনও শব্দই যথেষ্ট নয় এমন একজন ব্যক্তিত্বকে বর্ণনা করবার জন্য। তাই আমার বিশ্বাস মীরের জীবনের জয়গাথা এটি শুধু ওর কথা বলার জন্য লেখা নয়, শুধু ওর জীবনের চাওয়া-পাওয়ার গল্প নয়, এটি একটি স্বপ্ন-সত্যির গল্প। যে আমায় অনুপ্রাণিত করেছে, বারবার বহুভাবে, বহু কারণে। এই বই যেন আমার মতো হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে স্বপ্ন দেখার অনুপ্রেরণা জোগায়। স্বপ্নটাকে সার্থক করায় সাহস দেয়। আর সব শেষে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে।

এই বইটি লেখাকালীন আমি দুই থেকে তিনবার কলকাতা গেছি। নানা ভাবে মীরের সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবং তার সঙ্গে নানা রকমের লোকের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা সবাই কলকাতার মানুষজন। কেউ বা প্রতিষ্ঠিত, কেউ বা অজ্ঞাতকুলশীল। সামান্য মজুর বা সামান্য চাকুরে। এই বইটি মীরকে নিয়ে লেখা বলেই কলকাতার তথাকথিত তারকাদের সঙ্গে একাসনে আমি একটি অজানা, অখ্যাত মানুষকেও বসাতে পারলাম। কারণ ওর মুখ থেকেই শোনা — "স্টার বলে আলাদা হলাম কবে আমি? আমার কারবার তো সাধারণের মধ্যেই।"

BanglaBook.org

মানুষের মধ্যে মীর

"মীরদা অন্যরকম! উনি যেভাবে সবার সঙ্গে কথা বলেন, যেমন ভাবে আমায় ভালোবাসেন, মীরদা আলাদা। আমরা ওঁর খুব বড় ফ্যান। মীরদা অন্যরকম।"

বাবাই, মীরাক্কেল টিম।

বাবাই মীরাক্কেলের টিমের একজন সদস্য। মীর শুটিং স্পটে পৌঁছনো থেকে শুরু করে, শুটিং শেষে গাড়িতে না ওঠা অবধি মীরের ছায়াসঙ্গী বাবাই। মীর যখন রেডিও শেষ করে মীরাক্কেলের শুটিং-এ যায়, তখন ওর সঙ্গে থাকে তিনটি ব্যাগ। একটা লাঞ্চ বক্স, একটা ল্যাপটপ ব্যাগ, আরেকটাতে ব্যক্তিগত

কিছু টুকিটাকি জিনিস। শুটিং স্পটে পৌঁছনো মাত্র বাবাই সেই ব্যাগগুলো নিজের জিম্মায় করে নেয়। ফ্লোরে শুটিং শুরু হলে মীরের মোবাইল দুটোও থাকে বাবাই-এর হেফাজতে। বাবাই এমন একজন যার ওপর মীর ভরসা করে। ও না থাকাকালীন মীরাক্কেলের শুটিং স্পটে মীরের ঘরের তালাচাবিটাও বাবাই সামলে রাখে। খুব সাধারণ একজন মানুষ বাবাই। ভিড়ের মধ্যে খুঁজলে এমন হাজার হাজার বাবাইকে খুঁজে পাওয়া যাবে হয়তো, তবুও মীরের এই বাবাই যেন সবার থেকে আলাদা। নিজে খেতে শুরু করার আগে মীর বাবাইকে জিজ্ঞেস করে নেয়, "এই হতভাগা এইদিকে আয়। মুখটা শুকনো কেন? কিছু খাসনি? লাঞ্চ করেছিস?" এমন ঘটনা চোখের সামনে না ঘটলে বিশ্বাস করতাম না। তবে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে যেটা সবচেয়ে ভালো লেগেছিল, সেটা হল মীরের নরম মনটা। নিজের ক্লান্তি, ভোর থেকে ছুটে চলার শারীরিক ধকল, সকাল থেকে একভাবে কথা বলে চলা — এসব নিয়ে ওর শুকনো মুখটা হয়তো মেক আপের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে। তাই হয়তো নিজের ক্লান্ত দেহটার প্রতি এত উদাসীন মীর। বাকি সবার ক্লান্তি, শুকনো মুখ, খালি পেট — সবকিছুর খবর ওর কাছে। আর ওর খবর রাখে কে? ওর খবর রাখার জন্য তো রইলই হাজার হাজার ফেসবুক ফ্যান। মাইলের পর মাইল জনস্রোত। বাকি সাধারণ এবং খ্যাতনামা মানুষরা, যারা মীর বলতে অন্য কিছু না বলে প্রথমেই একগাল হেসে ফেলে।

"মীরকে আজ থেকে দেখছি না। আমার দোকান এখানে অনেক পুরোনো আছে। যবে থেকে মীর এ বিল্ডিং-এ কাম করে, তবে থেকে ওকে আমরা দেখি। ওকে দেখলেই আমার হাসি পায়। আর আমি ওর সঙ্গে চোখে চোখে মেলালেই ও আমায় দেখে জিজ্ঞেস করে, 'ভালো আছ?' এই শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-এ প্রচুর লোক আসে। সবাইকে হামি চিনে না। তবে মীরকে সকালে রেডিওতে শুনি, রাতে টিভিতেও মাঝে মাঝে দেখি। ও কোনদিনও হামার দুকান থেকে কিছু কিনে না। আমি ওকে সিগারেট পিতে ভি দেখি নাই কভি। বাবুলোগ হামকো কভি নহি পুছতা হ্যায় কুছ। মগর মীর যবভি মিলতা হ্যায় বহুত আচ্ছেসে বাত করতা হ্যায়। ওহি আচ্ছা লাগতা হ্যায়। বাকি তো হাম দুকান লেকে বিজি রহতা হু।"

বাবুলাল, পানবিক্রেতা, শান্তিনিকেতন বিল্ডিং এর পাশে। কলকাতা ক্যামাক স্ট্রিট।

বাবুলাল এ এলাকায় দোকান করেছে অনেকদিন। আর ওর দোকানটাও

BanglaBook.org

একদম গেটের পাশে হওয়ায় প্রচুর লোকজন বিশেষ করে যারা শান্তিনিকেতন বিল্ডিং-এ যাতায়াত করে তাদের সাক্ষাত পাওয়াটা খুব অসম্ভবও নয়। কলকাতা শহরে সেলিব্রিটি পাওয়াটা দুরূহ কাজ নয়। এমন অনেক জায়গাই আছে, সেখানে প্রায়ই রাতের অন্ধকারে কালো চশমা পরে তাঁরা আনাগোনা করেন। সে সমস্ত জায়গায় মবড হলে ক্ষতি নেই। সেখানে দু-চারটে সই দিতেও কোন আপত্তি নেই কারুর। কারণ সে জায়গাটার ভেতরে বাইরের আলো-হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। বরং বলা ভালো জোর করে ঢুকতে দেওয়া হয় না। সে অন্দরের কথা অন্দরেই থেকে যায়। সাধারণ মানুষ তা জানতেও পারে না, যদি না কোনও পাপারাজ্জির ক্যামেরায় কেউ ধরা পড়ে যান। এক্ষেত্রে বলা ভালো যে, সেলিব্রিটি তকমাটা একবার গায়ে লেগে গেলে এমনভাবে সান্ধ্যভ্রমণে বেরোতেই লোকে পছন্দ করেন। এই আলো-আঁধারির খেলাটা হয়তো সত্যি স্পটলাইটের থেকে বেশি প্রিয় কারুর কারুর কাছে। তাঁরা চিরকাল সাধারণের নাগালের বাইরে হয়েই থাকতে চান। 'মাস' অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে গাড়ির কাচের আড়ালে, উঁচু বেড়া দেওয়া, সিকিউরিটি ঘেরা স্টেজের ওপর থেকেই দেখতে পছন্দ করেন। কোনও ব্যক্তি বিশেষ নয়, গোটা সেলিব্রিটি সমাজটাই এই অলিখিত নিয়ম মেনে চলে এসেছে গত কয়েকটা যুগ ধরে। এই নিয়মের বাইরে বেরিয়ে কিছু করলে আবার সেটাও খবর হয়ে গেছে। হয়তো পুরোটাই যে কোনও রকম খবরের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই। ব্যক্তিগত আর পেশাগত জীবনের মধ্যে হয়তো সবসময় খবরের কাগজ, সাধারণ মানুষ এসে দাঁড়িয়ে দুটোর গণ্ডি মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে চেয়েছে বলেই জোর করে তাদের আলাদা করে রাখা। মিডিয়া সব জানতে চায়, সাংবাদিকরা অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে — এটা যেমন ঠিক, তেমনই এই লুকোচুরির খেলায় খবরও যেন তৈরি হয়ে যায় নিজে নিজেই। তার ওপর সাংবাদিকের কলমের ধার তো আছেই। যাই হোক, ফিরে আসি যেখানে ছিলাম। এই আলোচনাটা করার উদ্দেশ্য একটাই। আর সেটা পরে বাবুলালই স্পষ্ট করে দিল। ওর বয়ানে বাকিটা শুনলে আমার পাঠক বন্ধুরাও জানতে পারবেন কেন হঠাৎ আমি সেলিব্রিটিদের নিয়ে সমালোচনা শুরু করলাম।

"আমরা তো সামান্য পান, সিগারেটওয়ালা আছি। আমাদের উদের নিয়ে কোনও কাম নেই। উরা এল গেল, আমরা দেখিও না। দুকান নিয়ে সারাদিন পড়ে আছি। তবে মীরবাবু যখন হেসে কথা বলেন আমাদের সঙ্গে, তখন ভালো লাগে। উনি আমার নাম ভি জানেন। কোনওদিন আমার দোকানে আসেনি, তবু ভি জানেন। এটাই ভালো লাগে। বাকি হামাদের কথা আর কে ভাবে ম্যাডামজি।"

BanglaBook.org

আমি আগেও বলেছি, মীর সম্পর্কে এই বই লিখতে গিয়ে আমি কলকাতার অনেকটা কাছাকাছি এসে গেছি। কোনও সেলিব্রিটি না হয়েও একজন সাধারণ, অতি সাধারণ হয়েও আমিও কিন্তু কলকাতার এই বিশাল জন-অরণ্যে ওই সাধারণ লোকগুলোর কথা আজকের মতো করে ভাবিনি। রোজ যাতায়াতের পথে আমার পাড়ার মোড়ের রিক্সাওয়ালা, পানওয়ালা, ভারী, 'শিল কাটাও' বলে হেঁকে যাওয়া লোকটা — এদের কারুর নাম তো আমিও জানি না। সেলিব্রিটি শব্দটার সঙ্গে যে সেলিব্রেশনটা জড়িয়ে আছে সেটা যেমন অসামান্য কর্মদক্ষতার, তেমনই একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠারও সেলিব্রেশন। মীরের মধ্যে দুটোই যেন সমান জোরালো। ভাবলে ভালো লাগে যে, আজ অবধি যার সঙ্গেই কথা বলেছি, সেই মীর নামটা শুনে বলেছে, "ওঃ মীর! অ্যামেজিং পার্সোনালিটি। অ্যামেজিং পার্সন।"

আর সেই সুরেই সুর মেলালেন আরেকজন। রেডিও মির্চির ক্রিয়েটিভ হেড, রণজিৎ মাটগাওকার।

"Mir and I started in 1994, when private companies were given slots in All India Radio's main frequency. We started together and it was 1994, that's when I first met him. At that point of time, we were in radio station called Times FM. Times FM had shows in three languages in Kolkata, i.e. English, Hindi and Bengali and I used to do the English shows and he was doing Bengali. I don't think he had even finished college then. He was really young, something like 20 years. His shows in Bengali were very different than his style now. When he started he was funny off the mic, but on the mic he'd do emotional kind of shows, very warm and emotional, connected to music. I didn't know Bangla music, as I was mostly doing English music, but he dealt with Rabindrasangeet, Hemanta, Bangla film songs. He went to Assembly of God Church and lived in Ripon Street, and I think when he was in school, he was one of those guys who would always do shows on stage. He was just a natural mimic, who'd always do drama and things like that. He was also a very good writer. He was gifted with words. That was may be the phase of his career from 1994 to 1997 or 1998 and then I think he was so naturally talented, natural showman and so spontaneous, and quick witted, he started doing shows in Kolkata. He was

the MC (master of ceremonies) for tons of shows in the city. After that he left Times FM and carried on a career freelancing, doing shows and he might have even done some telefilms for all I know. By then Radio Mirchi began and that was the full privatization of FM radio. FM stations could own their own frequencies and we were 98.3. I used to be an English RJ and was made the Programming Head of the Kolkata Station. I said we're only launching the Kolkata station, if we have him back and he's gonna do the prime time show, the Breakfast show. I always thought this guy was an absolute killer and I was determined to get his funny side back, not the image which people knew of him before. He has a huge humorous side. He's a natural mimic and he'd just make all of us laugh at office just by mimicking people. He'd mimic me, he was hilarious. He was into the Bappy Lahiri spoof and so he killed the show. He was fantastic. I made him to do a natural character, and he ran a show called Pappi Da Ka Gaan. He actually went on translating Bappyda's songs into English and sang them with his accent. It was hilarious. It was played across the radio mirchi network and he was in the Breakfast show and he's doing it, my goodness for almost a decade, 12-13 years. Meanwhile he has done so much. He started Mirakkel on TV, which I've seen a few episodes and I find it really funny too. One of the few key points about him is that he's extremely spontaneous. He's the kind of guy who even can write very good scripts. But to be honest, he doesn't need scripts. He just does stuffs spontaneously. One of the natural born talents. I think what has also happened is radio has become a lot more informal, its form and he has that naturally. He is a workaholic. I don't know when he sleeps."

ঘুমের কথা উঠতেই আমার মনের মধ্যেও একই প্রশ্ন উঠল। শুটিং শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত এগারোটা। পরের দিন রেডিও মির্চির জন্য ভোর ৫টা ৪৫-এ বাড়ি থেকে বেরোনো। তার আগে ঘুম থেকে উঠে শরীরচর্চা। সত্যি কি তাহলে একটা মানুষ প্রতিদিন তিন-চার ঘণ্টা ঘুমায়? ওর শরীরে কি সত্যি তাহলে ক্লান্তি বলে কোনও বস্তু নেই। ঠিক জানি না।

BanglaBook.org

ক্লান্তি বা অসুস্থতার কথা মীরের মুখে শোনা যায় না একেবারেই। বরং সে সব নিয়ে প্রশ্ন করলে সহজ সুরে উত্তর আসে, "শরীর আমার ভালোই আছে।" "তাহলেও এরকম মেশিনের মতো খাটার শক্তি পাও কোথা থেকে?" মীর এত ধারালো উত্তর দেয় সব প্রশ্নের কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে একটু বাচ্চার মতো উত্তর না দিতে পারার অক্ষমতায় একটা লাজুক মুখ করে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ নয়নে। এটা সত্যি যে, এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো মীরের কাছেও নেই। যাঁরা ওর অনেক কাছে থেকে ওর সঙ্গে কাজ করেন, তাঁরা হয়তো বা বলতে পারবেন, প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা ঘুমিয়ে একটা মানুষ এতটা সজীব কী করে থাকতে পারে। আমিও তাই উত্তরের আশায় একদিন ফোন করলাম মীরের অন্যতম একজন অসম-বন্ধুকে। আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন, একজন অসাধারণ অভিনেতা, একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আমাদের সকলের চেনা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

দুপুর তখন দুটো হবে। আমি সেইভাবে সময়টা খেয়াল করিনি। আমার তখন সবে সকাল সাড়ে নটা। অনেক কাজের মাঝে ছুটি পেলে তবেই মীরের এই বইটা নিয়ে বসার সময় পাই। সেদিন এদেশে রাজার জন্মদিন বলে ছুটি ছিল। তাই তাড়াতাড়ি ফোন নিয়ে বসা — কথা সেরে লিখতে বসব বলে, খাতা কলম আর মোবাইল নিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসলাম। দেশে ফোন করতে হলে সাধারণত কম্পিউটার থেকে ভয়েপে কল করি। সেদিনও তাই করলাম। অন্যদিক থেকে পরাণদা ফোন ধরলেন, "হ্যালো।"

আমি বললাম, "পরাণদা আপনি কি লাঞ্চে আছেন? আমি কি অসময়ে ফোন করলাম? একটু কথা বলার ছিল।"

"হ্যাঁ খাচ্ছি। তবে কী দরকার বলুন? আপনি কে? কোথা থেকে ফোন করছেন?"

আমি একটু অস্বস্তিতে পড়েই বললাম, "সরি! আমি তাহলে পরে ফোন..."

কথাটা শেষ হবার আগেই অন্যদিক থেকে উত্তর এল, "না না ঠিক আছে, আপনি বলুন কী দরকার?"

"আপনি না হয় খেয়ে নিন। আসলে মীর সম্পর্কে কিছু কথা বলব বলে ফোন করেছি। কিন্তু আপনি খেয়ে নিন। আমি না হয় দশ মিনিট পরে..."

"মীর সম্পর্কে? ও আচ্ছা! মীর সম্পর্কে আমি কী বলব, ওকে তো আমি সোনা ছেলে বলে ডাকি। আচ্ছা। আপনি দশ মিনিট পরেই করুন। আমি একটু খেয়ে নিই, তারপর ফোন করুন।"

ফোনটা রাখার পর থেকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। মাঝে এখানে অফিস থেকে দুবার ফোন এল। কিন্তু ধরলাম না। লেখায় পেলে তখন

BanglaBook.org

বাকি কাজে আর যেন মন দিতে ইচ্ছে করে না। পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একজন অভিনেতা হিসেবে চিরকালই আমার খুব কমপ্লিট মনে হয়েছে। ওঁর চেহারায় আমাদের প্রজন্মের মতো ওই ছটফটানিটা কোনওদিনই লক্ষ করিনি। এত সাবলীল, এত বহুমুখী, এত সৎ একজন অভিনেতা উনি, যে বার বার মনে হয়েছে আমাদের প্রজন্মের হয়তো সত্যি ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু এখনও পাওয়া বাকি। সব সময় মনে হয়েছে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দক্ষতা তেমন ভাবে লোকের কাছে ধরা দেয়নি। তেমন প্রচারও পাননি ভদ্রলোক। প্রধানত থিয়েটারের মানুষ বলে অভিনয় আর মঞ্চকে ভালোবেসে অভিনয় করছেন। খ্যাতি বা যশোলাভের মোহ তাঁর আশেপাশেও থাকার সুযোগ পায়নি কখনও। হইচইয়ের বাইরে থাকা একজন অভিনেতা মানুষ হিসেবেও এত সাধারণ — মীরের কথা বলতে গিয়ে একজন অচেনা-অজানা মানুষের সঙ্গে যে কথা বলছেন, সে কথা ভুলেই গেলেন ভদ্রলোক। কেন জানতে চাইছি মীরের কথা, আমার ফোন করার উদ্দেশ্যটাই বা কী, সে সব জানতেও চাইলেন না একবারও। "মীরকে তো আমি সোনা ছেলে বলে ডাকি" — দ্বিতীয়বার ফোন বাজতেই ফোন ধরে আবারও ওই একই কথা বললেন।

আমি এবার আমার পরিচয় দিয়ে জানালাম আমার ফোন করার আসল উদ্দেশ্যটা কী।

"আরে বাঃ বাঃ! মীরকে নিয়ে বই! এ তো দারুণ একটা প্রজেক্ট। আমার শুভেচ্ছা রইল। বলুন আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি।"

আমি হেসে বললাম, "যদি আপনি ওর সম্পর্কে কিছু বলেন। এতগুলো বছর একসঙ্গে কাজ করেছেন। দিনের অনেকটা সময়ই তো একসঙ্গে এক ফ্লোরে কাটান। যদি কিছু বলেন।"

"মীর সম্পর্কে আমায় কিছু বলার কথা বললে, আমি জানি না কী বলব। আমার যে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে ওর সম্পর্কে। ওকে জানতে পেরে ওর সান্নিধ্যে এসে আমি যেন পরম তৃপ্তি লাভ করি। আমার সত্যি মনে হয় বিধাতা যেন ওর সৃষ্টি লগ্নে অধীর উদাসীনতায় তাঁর সৃষ্টির ভাঁড়ার থেকে দুবার করে সব দিয়েছেন। ও সত্যি ক্ষণজন্মা। মানব ঐশ্বর্যের সকলটুকু বড় বেশি করে নিয়ে ওর জন্ম হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ও যেন বিধাতার পক্ষপাতিত্বে সৃষ্টি হয়েছে। এত স্ট্রাগল, শৈশব, কৈশোরে এত লড়াই করেছে, তবুও ও যেন জয় করবার, নতুন করে শুরু করবার পূর্ণ আনন্দে ডুবে আছে। মীর হল দুষ্টুমির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ওর সঙ্গে আমার ওয়েভ লেন্থ যেন খেলা করে। আমার আবার অসমবয়সি বন্ধুই তো বেশি। বুড়োদের সঙ্গে আমার

BanglaBook.org

বন্ধুত্ব হয় না। মীরকে তাই আমি আমার অসম-বন্ধু ভেবেই আদর করি। স্নেহও করি। ওর মধ্যে মানুষকে আকর্ষণ করবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। মানুষের জীবনে হাসি তো খুব ক্ষণস্থায়ী, আর ও সেটাই প্রদান করে চলেছে। দিবারাত্র ভেবে চলেছে মানুষকে হাসাবে কীভাবে! এত আধুনিক রসবোধ, আধুনিক রসিক ভাবনা সচরাচর কারুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। উইট, ফান, স্যাটায়ার, আয়রনি — এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে হাস্যরস তৈরি করে। এগুলোকে বুঝে কাজ করতে হবে। এগুলোই বিশুদ্ধ রসের সৃষ্টি করে। মীর যেন তার সবটা গুলে খেয়ে নিয়েছে। কখনও কখনও কাউকে যখন ও র‍্যাগ করে বা পাতি বাংলায় বলতে গেলে চাটে, তখন দেখেছি মানুষ ওর প্রতি বিরূপ হয়। কিন্তু মীর সে সবকিছুকে গ্রাহ্যও করে না। খুব বুদ্ধিদীপ্তভাবে, কোনও প্রতিকূল অবস্থাকে নিজের অনুকূল করে তুলতে পারে মীর, আর সেটাও খুব শৈল্পিক ভাবে করে। ওর ওই চাতুরিটা বেশ দামী। সেটাই ওকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে এতটা। আমি সত্যি কামনা করি যেন আরও এগিয়ে চলতে পারে মীর, সব বাধা কাটিয়ে। একটা বড় শূন্য দিয়ে শুরু, কিন্তু আমার বিশ্বাস ও নিজের চেষ্টায়, নিজের মনের জোরে শেষটা দারুণ জমজমাট করে তুলবে।

"আর মীর খাটতেও পারে প্রচুর। কখন যে ও বিশ্রাম নেয় সেটা বোধ হয় খুব শক্ত বলা। কী করে পারে? সত্যি কী করে পারে আমিও তাই ভাবি। তবে হয়তো আমার উত্তরটা জানা। মনের মধ্যে যদি সর্বদা একটা রসিকতা প্রবাহিত হয়, রোগ দুর্ভাবনা এগুলো দানা বাঁধতে পারে না। ও সবসময় খুশিতে থাকে। আনন্দে থাকে। অর্থকষ্ট, সম্মানহানি, খাদ্যাভাব কোনও কিছুই ওর অজানা নয়। জীবনের সবটা অন্ধকার তো পেরিয়েই এসেছে ও। তাহলে দুঃখটাই বা কীসের? এটা করা খুব মুশকিল। সবাই পারে না। নিজের ওপরে চূড়ান্ত বিশ্বাস না থাকলে এটি পারা সম্ভব নয়। তাই তো বলি ঈশ্বর ওকে তাঁর অবসর সময়ে বসে, দারুণ আদরে, একটু একটু করে সৃষ্টি করেছেন! এমন ক্ষণজন্মা, সত্যি বিরল প্রতিভা।

"মীরের এই চতুর স্বভাব, এমন সহজ উইটের সঙ্গে আমি নিজেকে ভীষণ ভাবে রিলেট করতে পারি। আমার জীবনটাও একটা বড় শূন্য দিয়ে শুরু। থিয়েটার করবার ভূত মাথায় চেপেছিল অনেক ছোট বয়স থেকেই। তখন থিয়েটার মানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে থিয়েটারের দলে খরচ করতাম। অর্থাভাবে আমার স্ত্রীয়ের গয়নায় পর্যন্ত হাত দিতে হয়েছিল। আমার স্ত্রীয়ের সবচেয়ে বড় সতিন ছিল ঐ থিয়েটার। থিয়েটারের জন্য অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমাদের জীবনে, কিন্তু তবুও ভেঙে

BanglaBook.org

পড়িনি আমি কোনওদিনও। হয়তো অন্য একটা মনন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আর তাই কখনও হার মানব না, এরকমটাই বার বার মনে হত। মীরকে দেখেও আমার তাই মনে হয়, অপ্রতিরোধ্য। ও যেভাবে মানুষকে ভালোবাসে, মানুষের জন্য যেভাবে ওর প্রাণ কাঁদে, সেটা আজকের যুগে বিরল। মানুষকে ভালোবাসার মতো মানবজয়ের উপায় আর নেই। তাই হয়তো ভালোবাসার বদলেই মীর এত ভালোবাসা পেয়েছে। এত সম্মান পেয়েছে। এত জনপ্রিয়ও হতে পেরেছে।"

পরাণদা এতক্ষণ আমায় কোনও কথাই বলতে দেননি। গোটা সময়টা ধরে শুধু মীরের মহিমা বর্ণনা করতেই ব্যস্ত ছিলেন। কথা শেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতায় সাংবাদিক হিসেবে আমার নামটা অচেনা অজানা। কিন্তু তবুও পরাণদা মীরের সম্পর্কে এই কাজটা করবার জন্য সাধুবাদ জানালেন। তারপর এদিক-ওদিকের দু-চারটে কথা বলে আমিও ফোন রেখে দিলাম।

কেমন যেন রেশটা কাটতেই চাইছিল না বেশ খানিকক্ষণ। মীরকে যখন-তখন ফোন করা সম্ভব নয়। তবুও একটা মেসেজ করে জানালাম, "আমি সত্যি তোমায় ঈর্ষা করি। এত ভালোবাসে লোকজন তোমায়? তুমি সত্যি লাকি।" বেশ খানিকক্ষণ পরে মেসেজ এল একটা স্মাইলি। আর একটা বাক্য — "হ্যাঁ আমি সত্যি ভাগ্যবান!"

আজকাল যত বয়স বাড়ছে, সম্পর্কগুলো যেন ক্রমশ অন্য রকম একটা মাত্রা নিচ্ছে। অনেক কাছের মানুষ দূরে চলে যাচ্ছে, আবার দূরের মানুষ কাছে আসছে। অনেক পুরোনো সম্পর্ক যেমন পোষণের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, তেমনই সময়ের ঘূর্ণাবর্তে অনেক নতুন সম্পর্ক তৈরিও হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। প্রতিদিন কোনও না কোনও ভাবে কাউকে চেনা, জানা, ভালোলাগা, তারপর বন্ধুত্ব হওয়া। এইভাবেই হয়তো আমরা সবাই এগিয়ে চলি। আবার এটাও ঠিক যে, দিনের ওঠাপড়ার মতো, সম্পর্কেরও অনেক বদল ঘটে। কিন্তু অদ্ভুত লাগে ভাবতে যে, মীরের জীবনের সব সময়ের সব সম্পর্কগুলো আলাদা আলাদা ভাবে খুব খাঁটি ছিল বলেই হয়তো, গ্রন্থিটা শক্ত ছিল — এখনও প্রত্যেকটা সম্পর্ক আলগা হয়ে যায় নি। সত্যি বলতে কী, সময়ের ব্যবধান বা কোনও রকম কোনও ঘটনা, দৈনিক টানাপোড়েন — এই সবকিছু থেকে মীর সম্পর্কগুলো যেন আলাদা করে রেখেছে। যে সময়ের বন্ধু, সে যেন সেই সময়টাকে ঘিরেই রয়ে গেছে মীরের জীবনে। ছোটবেলার বন্ধু, কলেজের বন্ধু, রেডিওর বন্ধু, টিভির বন্ধু — সবাই তাদের মীরকে সেই তাদের মতো করেই মনে রেখেছে। প্রত্যেকের কাছে, তাদের সকলের কাছে

BanglaBook.org

মীর যেন ঠিক সেই আগের মতো। তাই হয়তো একই সুরে তারা সবাই বলতে রাজি, "মীর একটুও পালটায়নি।" সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলতে চলতে মীরও তাই বলে, "একবার বঙ্গ সম্মেলনে কানাডায় গিয়ে জেনিংসদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওদের ভোলাটা বেশ টাফ। যখন কানাডায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখনই জানতাম, রিহার্সাল, শো — এসবের ফাঁকে ওদের সঙ্গে দেখাটাও সেরে ফেলতে হবে। সুযোগটাও দুম করে এসে গেল। আমার কাছে ঠিকানাটাও ছিল। ছোটবেলার অনেক স্মৃতি। আমি যেমন বড় হয়েছি, বুড়ো হচ্ছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিগুলোও বুড়ো হচ্ছে। ফিকে হয়ে যায়নি শুধু। সময় পালটে গেলেও সম্পর্কগুলো পালটায় না। ছাপটা থেকেই যায়। আমার ভাগ্যটা ভালো। আজ অবধি যত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, বন্ধুত্ব হয়েছে, তারা প্রত্যেকে আমায় ভালোবাসে আর কোথাও না কোথাও একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে, সেটা থেকেই গেছে চিরকাল। সময় পালটে গেছে, সম্পর্কের চেহারাটাও হয়তো পালটে গেছে, কিন্তু তারা কেউ আমাকে ভোলেনি। আই মাস্ট বি লাকি। পালটাতে না চাইলে পালটানো যায় না। সবটাই ইচ্ছে, বস।"

যাই হোক, এবার ফিরে আসি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম। অভিনয় ক্ষমতা নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে এই অধ্যায়টা লিখতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু একটু অন্যদিকে ঘুরে গেল আলোচনাটা মাঝখানে। খানিকটা অবশ্য ইচ্ছা করেই এমনটা করলাম। মীরের অভিনয় ক্ষমতা নিয়ে কথা বলার জন্য যে কজন পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা সবাই পূর্ব-পরিচিত। কোথাও না কোথাও মীরের মুগ্ধ অনুরাগী। আর তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কগুলোও মীরের অন্য সব সম্পর্কের মতো অমূল্য। তাই হয়তো তাঁদের সঙ্গে কাজ করে মীর আজ অভিনেতা হিসেবেও বেশ খানিকটা খ্যাতি অর্জন করেছে।

আজকাল শয়ে শয়ে বাংলা সিনেমা আর হাজার হাজার টিভি সিরিয়ালের দৌলতে অভিনয় নিয়ে আলাদা করে পড়াশুনা করে কেউ শিল্পী বা অভিনেতা হয় না। অভিনয় করার প্রখরতা হয়তো বা খানিকটা নিহিত থাকে একজন সাধারণ মানুষের অভিনেতা হয়ে ওঠার গোটা পদ্ধতিটার মধ্যে। মীরের অভিনয় সত্তা নিয়ে আলোচনা করবার আগে তাই হয়তো ওর এই মানবিক দিকটা তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। এমনটা সত্যি যে রুপোলি পর্দার চমক বা চাকচিক্যে সাদা-কালো অর্থের দ্বন্দ্বে ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একজন সত্যিকারের অভিনেতা, একজন শিল্পীকে খুঁজে পাওয়া হয়তো বা কঠিনই হবে। যে কজন প্রতিষ্ঠিত নাম গত কয়েক বছর ধরে

BanglaBook.org

বাঙালি জপ করে চলেছে, তাঁদের মধ্যেও প্রকৃত শিল্পী হাতে গুণে বের করা যায়। তবুও সেই জায়গার মীরকে একজন অভিনেতা হিসেবে মেলে ধরার কোনও সুযোগই নেই। ইতিমধ্যেই ভিড় উপচে পড়ছে। তবুও মীরের ওপর এই বই লিখতে বসে, ওর ছোট্ট চরিত্রগুলো, ওর স্ক্রিন প্রেজেন্স নিয়ে আলোচনা করতে না পারলে পুরো ব্যাপারটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বলা বাহুল্য যে, মীরকে কলকাতায় বিভিন্ন মঞ্চে, স্টেজে, পর্দায় বহু ভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত দর্শক এবং শ্রোতারা। ভোরের আলোয় ঘুমন্ত শহরকে যেমন জাগিয়ে তুলেছে, তেমনই ব্যান্ডেজের সঙ্গে উত্তাল সুরে সুর মিলিয়ে শহরের বুকে যাদু বুলিয়ে স্বপ্নের দেশেও নিয়ে গেছে। ওর মধ্যে একটা জন্মগত ক্ষমতা না থাকলে ওই বিভিন্ন অবতারে ওকে হয়তো খানিকটা বেমানানই লাগত। তর্কের খাতিরে বলা যেতেই পারে, সেগুলো নিছক নকল বা মিমিক্রি মাত্র, সেখানে অভিনয়ের পরীক্ষা হয় না। হয়তো বা সত্যি! হয়তো আবার সত্যি নয়ও। এই নিয়ে তর্কের মধ্যে যাব না বলেই মীরকে একজন অভিনেতা হিসেবে যাঁরা স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

অঞ্জন দত্তের 'বং কানেকশন'-এ মীরকে শিল্পী হিসেবে অভিনয় করতে দেখা যায়। তারপরে আরও একটি বাণিজ্যিক ছবি, সেটার নাম 'অভিশপ্ত নাইটি'। প্রথম একজন অভিনেতার জায়গা ওকে করে দেন অনীক দত্ত। ছবির নাম 'ভূতের ভবিষ্যৎ'। ভুতোরিয়ার চরিত্রে মীরকে যেন কেটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ওর মতো করে ওই চরিত্রে হয়তো বা অন্য কেউ অভিনয় করতে পারত না। এত সহজে, কোনও জড়তা ছাড়া, কোনও ম্যানারিজম ছাড়া এত অনায়াসে কলকাতার তথাকথিত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একজন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজেকে ওইভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়তো বা শুধু মীরের পক্ষেই সম্ভব। শরীরের ভাষা, চলা-বলা এগুলো পরিচালকের কথা মতো ফুটিয়ে তোলাই যায়। কিন্তু সেগুলোকে ছাপিয়ে মীরের নিজস্ব আঙ্গিকে একজন মাড়োয়ারিকে নিজের মধ্যে ওইভাবে ফুটিয়ে তোলা সত্যি প্রশংসনীয়। অনীক দত্তের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, প্রথমেই উনি উৎসাহিত হলেন এই শুনে যে, মীরকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কেউ কিছু লিখছে। যে ভাবে অনীক দত্ত আমার এই প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানালেন তাতে এইটুকু বুঝলাম, মীরকে উনি কতটা কাছ থেকে জানেন, চেনেন আর ভালোওবাসেন।

কথা বলতে শুরু করলেন অনীক দত্ত। ফোনে ৫-১০ মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে ছিলাম। কিন্তু মীরের কথা বলতে শুরু করলে হয়তো কারুরই বিশেষ সময়জ্ঞান থাকে না। প্রথম আলাপের কথা বলতে শুরু করলেন অনীকদা। কেন মীরকেই বেছে নিয়েছিলেন ভুতোরিয়ার ওই চরিত্রে।

BanglaBook.org

"There's bit of a history to that. Mir keeps mentioning or rather used to mention in some of his events also. Mir! Oh when I had first come across him, or should I use the word – 'discover' Well, for my case it was a discovery, in the sense, it was the discovery of his voice. This was long before he became what he is today — a known face, a personality, a known voice for radio and television. He was the RJ then, working in a radio station (now I can't remember the name) where he had joined straight out of college, or may be if I'm not mistaken, he was still in college. I used to then work for an advertising agency named J. W. Thompson. At that time it was known as Hindustan Thompson. I had left J. W. Thompson and started making advertising films. Those days we made mostly corporate films, as television commercials were hardly made from Kolkata. A big component of these corporate films was voice-overs. For a long time, people were not making these kinds of films from Kolkata, hence standard voice over artists were not available. So we had to go to either Bombay or Delhi to record these. But I was quite desperate about finding someone from Kolkata itself. So one day, I heard Mir's voice over the radio. The commercial that I was shooting was a bilingual or a trilingual. So Mir just was perfect, as he can speak in more than one language. I found out where their office was and I landed up there and met him. It was early 90s, something like 94 or 95, and we did the recording. So that's how the association began.

"Slowly he became really famous as a radio jockey. But no one knew his face. His television debut was, if I remember correctly was 'Hau Mau Khau'. Somewhere around this time, in one of the episodes of 'Hau Mau Khau', I saw some glimpses of his mimicry. I was then doing a series of commercial for a biscuit company, in which I was using a few characters like Bappi Lahiri, Mithun Chakraborty, P. C. Sorcar and Rituparno Ghosh. Mir would be excellent in doing their mimicry. The other three looks didn't work out, I had written a script on Ritu and we had done a make-up test. Make-up wise Ritu's character worked out better so did not go

ahead with others. We actually shot that and eventually it was aired and it generated some amount of reactions. Unlike Bombay where people are used to these kind of a thing — its a long tradition there, but here in Kolkata — I don't think people quite liked it. And Mir started pushing the whole thing. He started doing things on award functions, as he's quite open about these issues. One thing I really admire in him that, he makes strong political insinuations which actually displeases a lot of people. Apparently Ritu took this very sportingly specially in public. In fact at some point of time, I also thought that perhaps it was not a good idea, for the others it was just a behavioural thing but whatever it is there was a big public spat between the two.

"But without talking about further controversies, let me zoom into Mir now. As I always thought why he wasn't doing films, cause by that time he was almost doing everything. He was a stand-up comedian, he was a television anchor hosting shows, he was a mimic, he had his own band and he was a voice-over artist. But apart from guest appearances in Bong Connection, there was not much of Mir. I thought he was always capable of a little more and when 'Bhooter Bhobishyat' came and frankly for that particular Bhutoria's role, one guy who would have fitted the role was Romada, Romaprasad Banik. But he was very unwell, which was one thing, and secondly when this character was being described, everyone was saying this was Romada's role. So I realized that it would be too much of a type-casting and he's done that to death. I had seen some of Mir's mimicry in various kinds of characters and I realized that for the first thing his Hindi was good and secondly this obangali Bangla he would be able to do that very well. And I really had this gut feeling that he would be perfect for this. So I said, it was Mir for sure, but a lot of people asked me to take Romada as it would be safer. But in the first reading, at least to me, it was quite clear that, it was Mir who would do the role. For Mir there was also quite a substantial kind of role for him as well.

"আর আমি রোলসগুলো করে দেখাতাম জেনারেলি সবাইকে। আমার

মনে আছে, একটা রিডিং করার পরেই মীরকে আর আলাদা করে আমায় কিছু বলতে হল না। পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় রিডিংটায় মীর was like 80% there. So by the time he came to set half of the stuff was done. It was in fact very smoothly done. The only problem was that, just before the shoot, I realized that there was a timing problem. He has the radio job in the morning so he can only be in the shooting after a certain point of time. So that was the initial problem as to how to squeeze things after he'd come which was around 12."

অনীক দত্ত কথা বললেন প্রায় টানা কুড়ি মিনিট। আমার রেকর্ডারটা তখন হঠাৎ একটা আওয়াজ করে থেমে গেছে। হয়তো বা ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উনি এমন সহজভাবে কথা বলে চলছিলেন, আমি মাঝখানে ওনাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে পারলাম না, বা বলার সুযোগ পেলাম না যে, ওঁর কথাগুলো আর রেকর্ড করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই ঠিক করলাম সমস্যাটার সমাধান করে আবার ফোন করব ওঁকে। কিন্তু উনি বলেই চললেন, ওঁর গলার স্বরে মীরকে ঘিরে ঠিক তখনও একই রকম উত্তেজনা। 'ভূতের ভবিষ্যৎ'-এর মীরের অনবদ্য অভিনয়ের কথা শেষ করে অনীক দত্ত শুরু করলেন তাঁর দ্বিতীয় ছবি আশ্চর্য প্রদীপের কথা। বললেন, "For my second film I wanted him somewhere, It was a very small bit in which he was there."

তারপরেই আমি ওঁকে পালটা প্রশ্ন করলাম মীরের অভিনয় ক্ষমতা নিয়ে। মিমিক্রি বাদ দিয়ে যে অভিনয়, সেই ক্ষমতাটা ওর মধ্যে কতটা সেটা হয়তো একজন পরিচালক ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। আমার প্রশ্নের উত্তরে অনীক দত্ত বলে উঠলেন, "The role which he had played in 'Bhooter Bhobishyat' was a caricaturist, almost a stereotype, and for this film I wanted a stereotype and caricature is more of his forte. He is genuinely good at it. When it comes to serious acting, serious roles, I do not know if he would be interested in taking a plunge into it, as he's so busy with other things."

যখন রেডিওর সঙ্গে মীরের সম্পর্কের কথা লিখতে বসেছি, তখন রেডিও জগতে একসময় যাঁরা রাজত্ব করে গেছেন, যাঁরা একটা সময় মীরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলাটা খুব জরুরি মনে হল। মীরকে জিজ্ঞেস করলাম, "কার সঙ্গে কথা বলা যায়, যিনি তোমার রেডিওর কেরিয়ার

নিয়ে মন্তব্য করতে পারবেন।" মীর এক বাক্যে বলে উঠল, "ঊর্মিমালা বসু, জগন্নাথ বসু।"

যোগাযোগটা করা সহজ ছিল। মীরই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। ঊর্মিমালা বসুর সঙ্গে কথা বলার পরে খানিক্ষণ আমিও যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইলাম। ওঁর মুখ থেকে মীরের কথা শুনে সত্যি যেন মীরকে আরেকবার একটা নতুন আঙ্গিকে জানলাম।

শুধু জিজ্ঞেস করার অপেক্ষা মাত্র। এত সুন্দর করে মীরের সম্পর্কে বলে উঠলেন, জানি না তত সুন্দর করে আমি লিখতে পারলাম কিনা।

"আমায় মীরকে চিনিয়েছে আমার মেয়ে ঋদ্ধি। ও তখন অফিস যাওয়ার সময়, রেডি হতে হতে রেডিওতে মীরের শো-টা শুনত। আর ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও এনজয় করতাম ইমেন্সলি। তারপর যা হয়, মীরের উইট, ওর সেন্স অফ হিউমার, যেগুলোর সবাই খুব ভক্ত, আমিও তার এক্সেপশন নই। কিন্তু এই সব কিছুর বাইরে যখন ওর সঙ্গে আমার কথা হয়, যাদবপুরে কোনও একটা অনুষ্ঠানে সেখানে ও প্রেজেন্ট করে আমাদের, তখন আমি একটা অন্য মীরকে দেখলাম। সেই মীর শুধু দুষ্টুমি করে না, শুধু হালকা কথা বলে না। ওর একটা হেরিটেজ আছে, রেডিওর সঙ্গে ওর একটা বন্ধন আছে। কী রকম ভাবে বোঝাই? একলব্যের কথা তো আমরা সবাই জানি? মীর যেন সেই একলব্যের মতো। শুনে শুনে শিক্ষা। যেহেতু ওর জীবনে একটা সময় রেডিও ছাড়া আর কোনও এন্টারটেনমেন্ট ছিল না, সেহেতু আমার মনে হয় ও যেন রেডিওর সন্তান। ও শুধুই রেডিও শুনে বড় হয়েছে। যার জন্য ও আমাদের চেনে, আমাদের জানে, শ্রাবন্তী মজুমদারকে জানে। সেই সময়টা যখন আমরা রেডিওর জগতে রেন করেছি, মীর সেই সময়টায় রেডিওর সঙ্গে বসবাস করেছে এবং তার ফলে ওর যে হোমওয়ার্ক, ওর যে তৈরি হওয়া, সমস্তটা কিন্তু রেডিওকেন্দ্রিক। আর একটা কথা না বলে পারছি না। রেডিও আমাদের কিছু ভ্যালুজ শিখিয়েছিল। হাউ টু টক উইথ এল্ডার্স। এখন যেমন হয়েছে না? হাই-হ্যালো? দেখা হলেই হাই-ইয়া। এইভাবে কথা বলার ধরন, তখন তো সেটা ছিল না। তখন একটা নম্র ব্যাপার ছিল, বড়দের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে একটা নম্র ভাব থাকত। এই নম্রতাটা না থাকাটা দোষের না, কিন্তু থাকলে আমাদের জেনারেশনের বেশ ভালো লাগে। আর ঠিক সেই নম্রতাটাই আমি ওর মধ্যে খুঁজে পাই। একটা জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে এস এম এস পাঠালে কেউ কেউ 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে, আবার কেউ কেউ বলে 'থ্যাঙ্ক ইউ, প্রণাম নেবেন'। এই 'প্রণাম নেবেন' দুটো শব্দ হয়তো সত্যি সামান্য দুটো শব্দ, কিন্তু আমার জেনারেশনের জন্য এই দুটো শব্দের অনেক

BanglaBook.org

মূল্য। আমি মীরের মধ্যে এরকম একজনকে খুঁজে পাই। যেন একটা গোটা জেনারেশন নিয়ে ও ট্র্যাভেল করেছে। এখানে একটা ছোট্ট গল্প বলি। আমরা একটা লাইফ স্টাইল শো করি টিভি তে. 'ভালো আছি. ভালো থেকো'। সেখানে মীর একবার আমাদের গেস্ট হয়ে এসেছিল। এবং সেখানে যখন ওর ছোটবেলার গল্প শুনলাম, ওই যে সেই ছোট নিচু ঘরে মাথা নিচু করে ঢোকা। ওর বাবা-মার কথা, শুনেছি ওর কাছেই, ওর বাবা-মা ঈদে ওর জন্য জামাকাপড় কিনতেন, কিন্তু নিজেদের জন্য কিনতেন না। এইসব মুহূর্তগুলো মীর ভোলেনি এবং এই সব জিনিসগুলো মীরকে একটা আলাদা সত্তা দিয়েছে। একটা আলাদা এ্যাসপেক্ট অফ হিজ বিয়িং। এমনকী যারা ওকে ফেসবুকে ফলো করেন, তাঁরা হয়তো জানবেন ও যে বাবুর সঙ্গে কয়েকটি বেশ মজার মুহূর্ত শেয়ার করে, সেখানে বাবু ওকে গালে একটা চড় মারছে (বাবু অর্থাৎ রেডিও মির্চির একজন হাউসকিপিং স্টাফ মেম্বার), তাকে নিয়ে মজা করছে, এই ধরনের সাবজেক্টকে নিয়ে হিউমার করাটা একটা ভীষণ ব্যাপার। অনেক রিস্ক ফ্যাক্টারও আছে এর মধ্যে। তবুও সেটা ও কী সুন্দর সাবলীল ভাবে করে ফেলে, ওর মধ্যে সেই কমনিসমটা আছে। প্রত্যেকটা মানুষকে আলাদা করে সম্মান করতে জানে ও। যখন ও স্টেজে দাঁড়িয়ে পরাণদার সঙ্গে মজা করে, ওর পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় অনেক মজার মধ্যেও কোথায় যেন একটা রেভারেনস আছে। মীর আমাকে অনস্ক্রিন নমস্কার করেছে। তোমার হয়তো মনে হতে পারে যে আমি খুব ফ্যাসিনেটেড উইথ নমস্কার। সেটা না কিন্তু। শরীরের কতগুলো ভঙ্গী থাকে। তাই দিয়েই বোঝা যায় যে, মানুষ হিসেবে সে কী রকম।"

আরও অনেক রেডিও জকি যারা আছেন তাঁদের থেকে মীর কতটা আলাদা যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন কোনও দ্বিরুক্তি না করে বলে উঠলেন, "প্রেজেন্ট ডে রেডিও জকিদের মধ্যে মোস্ট অফ দেম ভালো উচ্চারণ জানে না। মীর অথচ কোনও কায়দার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেও যায়নি, কিন্তু সব সময় তো পুঁথিগত বিদ্যা কাজে লাগে না। কোথায় তোমার রক্তের ভেতরে বাংলা গান খেলা করে, পুরোনো রেট্রো কোথায় তোমার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে, বৃষ্টি পড়লে হয়তো সেই গানগুলোর কলি ভেসে আসে মনের মধ্যে। মীর ভীষণ মডার্ন, কিন্তু তবুও ওর মধ্যে একটা সাবেকি ব্যাপার আছে এবং এই দুটোর সহাবস্থান একটা নতুন গন্ধ এনে দেয়, নিজের গন্ধ সৃষ্টি করে, আর সেটাই বোধ হয় সবাইকে সবার থেকে আলাদা করে রাখে। মীরের সেই নিজের গন্ধটা যেন ওকে সত্যি সবার থেকে আলদা করে রেখে দিয়েছে।

BanglaBook.org

"আমি আমার মতো করে মীরকে বেছে নিয়েছি। আমার যখন মীরাক্কেলের স্থূল জোকগুলো দেখতে ইচ্ছে হয় না আমি দেখি না। কিন্তু জানি যে, মীর সেইখানে আটকে নেই। সেখানে মীর পপুলার 'মাস'-এর জন্য। কিন্তু ওকে দেখে আমার যেন মানুষের সেই সাদা কালো চেহারাটার প্রতি আরও বিশ্বাস জন্মেছে। আমি জানি যে, ওটা জন-মনোরঞ্জনের জন্য করছে। সেই যে হিউমার, সেই হিউমারের পালসটা ফিল করেছে বলেই এই ক্লাস অফ পিপলের মধ্যেও মীর এত বিখ্যাত।

"মীরের কিছু জিনিস আমায় নাড়া দিয়ে যায় মাঝে মাঝেই। ঈদের সময় যেমন এক থালা মিষ্টির ছবি দিয়ে ফেসবুকে লিখেছিল, এই মিষ্টিগুলো আমার বাবাকে খুব খাওয়াতে ইচ্ছে করে। ওই পোস্টটা দেখে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমার ছেলেমেয়েরা আমায় খুব ভালোবাসে। মীর আমার ছেলের বয়সি। তাই ওর বাবা-মার প্রতি সম্মান, ভক্তি, ভালোবাসা এইগুলো দেখে আমার চোখে জল চলে আসে। মীর সত্যি একটা আইকন।"

সাত

রেডিও জকি মীর, গায়ক মীর, সঞ্চালক মীর আবার অভিনেতা মীর — এতগুলো অবতার! সত্যি বলতে কী, দর্শক বা শ্রোতা হিসেবে আমরা মীরকে প্রত্যেকটি চরিত্রেই আলাদা আলাদা করে চিনেছি। রেডিওর মীরের সঙ্গে টেলিভিশনের মীরের কোথায় যেন একটা বিশাল ফারাক। সকালের স্নিগ্ধতা গায়ে মেখে কলকাতা ওর গলার সুরে জেগে ওঠে। সেখানে মীর, কতটা স্নিগ্ধ, কতটা সবুজ, সতেজ সেটা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না! আবার সেই মীরই টিভির পর্দায় এত উচ্ছল, এত চঞ্চল, এত সজীব। টিভি এবং রেডিও — এই দুই মাধ্যমেই সমান ভাবে দাপিয়ে বেড়ায় ও। দুটো আলাদা ভঙ্গীতে। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এর মধ্যে কোনটা তোমার প্রেফার্ড অবতার!" হেসে ফেলে মীর বলেছিল, "আমি হলাম ওই একটা ধান চাষ করা চাষার মতো। যে প্রথমে ধান চাষ করে, তারপর ধীরে ধীরে শাক-সবজি চাষ করা শুরু করে। কিন্তু তাও ধান চাষটাই তার কাছে প্রধান হয়ে থেকে যায়। আমিও তেমনটাই। আমার প্রথম রেকগনিশন পাওয়ার জায়গা হল আমার রেডিও। সেখান থেকে তো সবটুকু পাওয়া। তাই সিঙ্গার মীর, এ্যাঙ্কর মীর, এ্যাক্টর মীর — এগুলোর ওপরে নিজেকে রেডিও জকি হিসেবেই আমি দেখতে চাই। রেডিও ছাড়া আমি নিজেকে কমপ্লিট ফিল করি না। যেদিন হয়তো শরীরের জন্য বা অন্য কোনও কারণে আমায় রেডিওর শো বন্ধ

BanglaBook.org

করতে হয়, সেদিন সারা দিনটা আমার খুব ডিপ্রেসিং কাটে। আমার বিকেলের কোনও শো ক্যান্সেল করতে হলে ততটা দুঃখ হয় না, যতটা সকালে রেডিওর প্রোগ্রাম ক্যান্সেল হলে কষ্ট হয়। When I am on air in the morning, I fly through the day."

তবে রেডিওটাকে শিকড় করে বাকি যে বিস্তার মীরের, সেসব জায়গাগুলোই ওর মনের খুব কাছাকাছি। এখানেই বোধ হয় ও অন্য অনেকের থেকে আলাদা। শিকড় থেকে আলাদা না হয়ে মহীরুহের মতো বেড়ে উঠেছে মীর। কোন জায়গা থেকে কোথায়! হাজার হাজার মানুষের সামনে পারফর্ম করছে লাইভ। হাজার দর্শকের ভিড়ে তবুও নিজেকে হারিয়ে ফেলছে না।

"এই লাইভ পারফরম্যান্সের শুরু ব্যান্ডেজের শো দিয়ে। মীরাক্কেল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যান্ডেজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু লাইভ পারফরম্যান্স শুরু হয় ২০১০ থেকে। যখন প্রথম তৈরি হল, তখন মেনলি একটা কমিক ব্যান্ড হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। To create a sound effect! কিন্তু কখনও সেটাকে নিয়ে একটা ফর্মাল ব্যান্ড তৈরি করব, সেরকম কিছু ভাবিনি কোনদিনও। বাট, হ্যাঁ এটা ঠিক যে, চিরকাল গান বাজনায় একটা জেনুইন ইন্টারেস্ট ছিল। স্কুলেও প্রচুর গান গাইতাম। আসলে ছোটবেলা থেকে রেডিওটা এত মন দিয়ে শুনতাম যে, গান ব্যাপারটা কোনওভাবে যেন আমার সারা দিনটা ঘিরে থাকত। গান বা যে কোনও রকমের মেলডি। ২০০৬ থেকে ২০১০-এই চার বছরে ব্যান্ডেজ ব্যান্ড হিসেবে, একটা মিউজিক্যাল ব্যান্ড হিসেবে কতটা বিখ্যাত বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জানি না, তবে মীরাক্কেলের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, এটা ঠিক। আর হয়তো সেই কারণেই ২০১০-এর অক্টোবর মাসে আমাদের অর্থাৎ ব্যান্ডেজের লাইভ পারফরম্যান্সের একটা সুযোগ এল। স্বভূমিতে, উনিশ কুড়ি ম্যাগাজিনের ব্যানারে একটা ট্যালেন্ট হান্ট হয়েছিল। ৮ই অক্টোবর ছিল সেই ট্যালেন্ট হান্টের গ্র্যান্ড ফিনালে। সেখানেই ব্যান্ডেজ প্রথম লাইভ শো করল। সেই থেকে আমাদের যাত্রা শুরু। আমরা লাকি যে, সেই ২০১০-এর প্রথম শো-এর পরে আমরা কিন্তু থেমে থাকিনি। এটা ২০১৫, আগস্ট মাস। এই লাস্ট ৫ বছরে আমরা সব মিলিয়ে ২৪০টা শো করেছি এবং প্রত্যেকটার কথা আজও চোখ বন্ধ করলে যেন পরিষ্কার মনে পড়ে। প্রত্যেকটা শো-এর মাইনিউট ডিটেলস আমার স্পষ্ট মনে আছে। কবে কোন শো-তে প্যাডেল পাম্প কাজ করছিল না, কোন শো-তে আর কী হয়েছিল সাউন্ড চেকের ছোট থেকে ছোট জিনিসগুলো মনে আছে আমার। ফ্রম সেটিং আপ দ্য স্টেজ টু ডিসম্যান্টলিং, সবটা মনে আছে।"

মীরের স্মৃতিশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস কেউ খুব একটা পায় না।

BanglaBook.org

কারণ মীর আজ অবধি কোনও কিছু ভুল করে ফেলেছে, এরকমটা হয়নি। ভুল করা তো দূরের কথা, ভুলে গিয়ে কিছু মিস করাটাও ওর স্বভাব নয়। কী করে যে সবকিছু এরকমভাবে মনে রাখে ও, সেটা ও-ই জানে। এর জন্য আলাদা রকম কোনও অনুশীলন দরকার হয় কিনা আমার জানা নেই। হয়তো বা তুলনামূলক ভাবে বেশি 'এ্যাক্টিভ মাইন্ড' বলে সবটুকু সহজে স্মরণে থাকে। ওর ব্যস্ত সেডিউলের মতন মনটাও তো সদাব্যস্ত। সর্বক্ষণ সব ঘটনার মধ্যে থেকে রসদ খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা করে চলেছে। সবসময় সব তথ্যের সঙ্গে ওর সহজাত উইট মিশিয়ে সেটিকে ওর মতো করে উপস্থাপনা করা, এর জন্য সজাগ হৃদয়, সজাগ মনন এবং খোলা মন — সবগুলোরই প্রয়োজন।

ব্যান্ডেজ নিয়েও তাই মীর আর বাকি সবকিছুর মতোই সিরিয়াস। যখন ব্যান্ডেজের জন্ম বৃত্তান্ত জানতে চাইলাম ওর কাছে, মীর হেসে বলল, "নামকরণটা কিন্তু সত্যি ভেবেচিন্তে করা। কারণ আমরা জানতাম গান গাইতে গেলে মার খেয়ে ফিরে আসতে হবে। তাই ব্যান্ডের নাম ব্যান্ডেজ।

"যখন আমরা শো করতে স্টেজে উঠতাম, আগেই বলতাম ধন্যবাদ স্যার। ব্যান্ড হিসেবে আমরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে আপনারা ছাড়া আমাদের গতি নেই। আপনারা ডাকলেন, কৃপা আপনাদের, এবার আমরা হয়তো একটু খেতে পাব। We always had a funny facade to it. To make it show that we know nothing and that I'm the fool — It wasn't easy always to play the fool. But I did. I did! এটা তো সত্যি যে আমরা কেউই মিউজিকের বিশাল বোদ্ধা নই। আর এটাও সত্যি যে ব্যান্ডেজের শো-তে, no one comes to listen to music! ব্যান্ডেজের শো মানে চুপ করে বসে গান শোনার জায়গাও থাকে না সেখানে। সেখানে লোকে প্রাইমারিলি এক্সপেরিয়েন্স করতে আসে, Brand Mir, live! আর আমি কোনওদিনও গানের তালিম নিয়ে গান করি না। যে গানগুলো শুনে বড় হয়েছি, যে গানগুলো পপুলার হিট, সেগুলোই করে থাকি আমরা। আর তাছাড়া মীরাক্কেলে যে গানগুলো তৈরি হয়েছে এতগুলো বছর ধরে, সেগুলো গাইবারও একটা ডিম্যান্ড থাকে। স্টেজে উঠে, ওই অজস্র লোকের সাথে কোথায় যেন আমি অদ্ভুতভাবে কানেকটেড হয়ে যাই and that insta connect keeps happening! গত পাঁচ বছরে আমরা ২৪০টা গিগ্‌স করেছি। আর তার মধ্যে এ্যাভারেজ উইকে একটা করে গিগ্ তো বটেই। এই এতগুলো শো-তে প্রত্যেকবার আলাদা আলাদা ভাবে ব্যান্ডেজ একটা ব্যান্ড হিসেবে ইভলভ্ করেছে। অন্য ব্যান্ডে তো সবাই শুধু ফ্রন্ট ম্যানকে চেনে। কিন্তু ব্যান্ডেজের প্রত্যেকটি ব্যান্ড মেম্বার পপুলার। তারা তাদের নিজেদের গুণেই সুপ্রতিষ্ঠিত আজ। The fact that

BanglaBook.org

I'm proud of today is that Bandage is a band where the team spirit reigns supreme! We sing together, we enjoy together, we share the stage together. and in fact we've equal payment system as well, so we enjoy the benefits together as well. Bandage is perhaps the only band which has gained popularity without any single album back-up. The only thing bandage banks upon is Mirakkel. আর সেই জন্যই হয়তো অন্য কোনও ব্যান্ডের সঙ্গে আমাদের কম্পিটিশানের জায়গা নেই। We even share a healthy coexistence! ব্যান্ডেজ সত্যি হয়তো সম্পূর্ণ গানের ব্যান্ড না। Bandage is more of Brand Mir! দর্শকরা এটাকে একটা প্যাকেজ হিসেবে দেখেন। সেখানে গানের সঙ্গে মজা আছে, মীরের পাগলামি আছে, আর আছে নির্ভেজাল আনন্দ।

"আজও মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়! ডুয়ার্সের উত্তরবঙ্গ উৎসব। ব্যান্ডেজের শো দেখতে ৮০,০০০ লোক। উপচে পড়েছে ভিড়। গানের জন্যও হয়তো সবটা নয়। আমাদের স্পিরিট, আমাদের উপস্থাপনা, হাসি, আনন্দ আর অতগুলো লোকের উন্মাদনা, গোটা সন্ধ্যেটা যেন চোখের পলক ফেলার আগেই শেষ হয়ে গেল। আমরা তখন বাগডোগরা থেকে ফ্লাইট নিয়ে কলকাতা ফিরব। জিৎ গাঙ্গুলির শো সেদিন। আমাদের শো-এর পরের দিন। জিৎ বম্বে থেকে ফ্লাই করছে বাগডোগরা। আমার কাছে এস এম এস এল — "করেছ কী মীর! ফাটিয়ে দিয়েছ কাল শুনলাম। ৮০০০০ লোক! আমার তো বেশ টেনশন হচ্ছে।" ডুয়ার্স ছাড়াও বর্ধমানে একবার রাজ কলেজে ২৫০০০ লোক হয়েছিল ব্যান্ডেজের শো-তে। আর কলকাতায় পুজোর সময় ম্যাডক্স স্কোয়ারে দশ-পনেরো হাজার লোক তো স্বাভাবিকভাবেই জড়ো হয় ব্যান্ডেজের শো দেখতে।

"সত্যি বলতে কী, লোকসংখ্যা দিয়ে ব্যান্ডেজের শো-এর পপুলারিটি কোনদিনও বিচার করিনি আমরা। গান ভালোবাসি, আনন্দ করতে ভালোবাসি। এটাও জানি গানটা আমার সাংঘাতিক স্ট্রং পয়েট নয়, যেহেতু ফর্মাল ট্রেনিং নেই আমার। তাই কখনও এমনও হয়েছে যে, স্টেজে উঠে বলে দিয়েছি, গানটা না হয় থাক? গানটা না হয় অন্যদিন হবে? এরকম তো অনেকবার অনেক জায়গায় শুনেছি, অনেক সাংবাদিকও প্রশ্ন করেছে আমায়, 'তুমি আর কী কী করবে? গানটা না হয় না-ই বা করলে।' সেই জায়গাটা থেকেই তখন স্টেজে উঠে বলেছি যে, গান বাদ দিয়ে বাকি মজাগুলো হোক, লোকজন কিন্তু সেটাকেও মেনে নেয়নি। এটা ভাবতে বা আজ বলতে ভালো লাগে যে লোকে প্রধানত মীরকে দেখতে চেয়েছে। এবার সেই মীর যেটাই করুক, সেটাই

BanglaBook.org

এ্যাক্সেপ্টেড হয়েছে। এই জন্য হয়তো আমি সত্যি লাকি!"

একটা গোটা জীবনকে কিছু কথা আর ভাষার অলংকারে সাজিয়ে তোলা যায় ঠিকই, কিন্তু খাতার পাতায় বন্দী করে রাখা যায় না। এই বইটি লিখতে লিখতে তাই কতবার আনমনা হয়ে মীরের জীবনের ব্যাপ্তিটাকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য, ব্যর্থতাই জুটেছে বার বার। মীরের জীবনের যে সাবলীল বহমানতা, তাকে আমার ভাষার ভূষণে জমকালো করতে পারলেও ওর এগিয়ে চলার গতিটার প্রতি কতটা সুবিচার করতে পেরেছি আমি সেটা জানি না। হয়তো আমার থেকে ভালো সেটা মীর নিজে বলতে পারবে। লেখা চলাকালীন, যতবার বলেছি, 'একবার পড়ে দেখো', ততবারই মীর বলেছে, 'লেখো না তুমি, আমি সবশেষে পড়ব।' জানি না আমার লেখার ওপর মীরের এই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পেরেছি কিনা। আমি সত্যি জানি না, ওর মতো করে, ওর হাতে গড়া জীবনটার আমি সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছি কিনা। অবশ্য এটাও ঠিক যে, এই সুদূরে বসে, সামান্য একজন গুণমুগ্ধ হয়ে কী করেই বা ওর জীবনের এই বিশাল কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করব আমি? আমার ক্ষমতাই বা কতটুকু?

প্রথমেই বলেছি, এটি একটি সামান্য প্রয়াস। মীরের গুণমুগ্ধ হিসেবে, এটাই আমার ওকে দেওয়া সবচেয়ে বড় উপহার। একজন লেখকের কাছে, তার ভাবনা আর ভাষার থেকে দামী আর কি-ই বা হতে পারে? তাই তো ওর কথা লিখতে বসে, বার বার ভাবতে হয়েছে। নিজের স্বাভাবিক লেখার ছন্দ, নিজের ভাষাজ্ঞানকে বার বার চ্যালেঞ্জ করে বাংলা লেখার অনভ্যাসকে কাটিয়ে উঠে, যখন এই বইটি লিখতে বসলাম, শুরু করলাম, তখনও যেন পুরো আত্মবিশ্বাস ছিল না। কলকাতার সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করতে হলে সমকালীন সাহিত্যটা জানা যেমন জরুরি, তেমনই শহরের নামী সংবাদপত্রে লেখার ধারা অনুসরণ করাটাও জরুরি। কিন্তু আমার দুটোর একটাও করার উপায় এবং সুযোগ দুই-ই খুব কম। তাই মনের মধ্যে ভয়টা দানা বেঁধেছিল যে, যার কথা লিখে চলেছি সাধারণ মানুষের কাছে মেলে ধরব বলে, সেই সাধারণ মানুষের মতো করে লিখতে পারছি আমি কতটা। সে বিষয়ে সফল হয়েছি কতটা, সেটা তো সময় বলে দেবে, তবে এটুকু বলতে পারি যে, এই বই লেখার গোটা জার্নিটা খুব উপভোগ করেছি আমি।

এই বইটিতে হয়তো বা শুধুই মীরের কয়েকটা দিক তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি আমি। যে দিকগুলো সবার চেনা, সবার জানা। তাই হয়তো লিখতে বসে হাত কেঁপেছে বার বার। ঠিক ব্যাখ্যা করাটাও জরুরি ছিল, তাই হয়তো

BanglaBook.org

ভয়টাও বেশি ছিল। মীর টিভির পর্দায় যা, বা রেডিওর তরঙ্গে যেমন করে ভেসে আসে, ব্যান্ডেজের মঞ্চে যেমন করে সাবলীল ভাবে গান গায়, মীর নিজ জীবনে যে তার থেকে আলাদা কেউ নয় সেটা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরাটা বেশ কঠিন। কারণ সবাই অজানা তথ্য সন্ধানে বেশি আগ্রহী, বেশি উৎসাহী। যেটা দেখা, যেটা জানা-চেনা সেটা তো প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমির মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে যাবে। তাই হয়তো লিখতে বসে আমার বারবার মনে হয়েছে যেগুলো অজানা, সাধারণের সামনে সেগুলো প্রকাশ করে বাহবা নেবার থেকে, সবার চেনা মীরকে সবার মতো না করে মীরের মতো করে পরিবেশন করাটাই হয়তো শ্রেয়। তাই কথা বলেছি ওঁদের সঙ্গে, যাঁরা ওর সঙ্গে রোজ ওঠাবসা করেন। এমন কয়েকজন বাছাই করা লোকের সঙ্গে, যাঁরা ওকে মীর হয়ে উঠতে দেখেছেন। চলার পথে সাহায্য করেছেন। যাঁরা মীরের খুব কাছের লোক, তাঁদের সঙ্গে। অদ্ভুতভাবে অন্য মীরের সন্ধান মেলেনি তাও।

আমার সন্দিহান সাংবাদিক সত্তাটা বারবার আমায় বলে উঠেছে, স্ত্রী ডক্টর সোমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলাটা হয়তো বা জরুরি। আর মেয়ে মুসকান? সে কী বলছে? যার বাবা ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে, রেডিওর ওয়েভে ভেসে এসে তার ঘুম ভাঙায়, তার জন্য মেয়ের নিশ্চয় আলাদা কিছু বলার থাকবে? কিন্তু উত্তর সেখানেও মেলেনি। বলা বাহুল্য, আমার ঔৎসুক্য সেখানেও হার মেনেছে। মুসকানকে স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে আসার দায়িত্ব বেশিরভাগ দিনই মীরের। অন্য বাবাদের মতো ঘড়িতে নটা বাজলে অফিস যায় না মীর, এটাও যেমন সত্যি, আবার তেমনই, দুপুর তিনটের সময় ঠিক সব নিয়ম না মেনেই মেয়েকে স্কুল থেকে বাড়ি নিয়েও আসে। লাঞ্চ একসঙ্গে করে। তারপরের সময়টা পুরোটাই মুসকানের আর পরিবারের। এই সময়টা তাকে কেউ বিরক্ত করে না। সুতরাং যে নিখুঁত দুঃখ-সুখের মিশেলে মীরকে আমরা অনস্ক্রিন দেখি, 'হোম ফ্রন্ট'-এও মীর ততটাই পারফেক্ট এবং দায়িত্ববান।

একবার গাড়ি করে ওর সঙ্গে কোথাও একটা, কোনও শুটিং স্পটে যাচ্ছিলাম। সম্ভবত মীরাক্কেলের শুটিং দেখতেই। গাড়িতে যেতে যেতে হঠাৎ ফোন বাজল। অন্যদিকের কণ্ঠস্বর কানে না আসলেও আমি মীরকে যা বলতে শুনলাম তা অনেকটা এইরকম।

হ্যাঁ আমি পাঠিয়ে দেব। ঠিক বারোটার সময়।

পাড়ার কোনও মিষ্টির দোকান হলেই হবে তো, না অন্য জায়গার

BanglaBook.org

দরকার?

- নাঃ! আজ আমার প্রোডাকশনের গাড়। আমার আজ গাড় লাগবে না।

- নাঃ! আপনি ভাববেন না। ঠিক সময়ে ও মিষ্টি পৌঁছে দেবে।

যেহেতু ফোনটা আমাদের কথা বলার মাঝখানে এসে পড়েছিল, খুব স্বাভাবিক ভাবেই মীর ফোন রাখার পরে একটা 'সরি' বলে, তারপর বলল, "আব্বার ফোন। আজ আমাদের বিল্ডিং-এ একজনের গৃহপ্রবেশ। কোথা থেকে মিষ্টি কিনবেন, আর কে মিষ্টি এনে দেবে সেটা জানার জন্য ফোন করেছেন আমায়।"

আমি বেশ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। এমনভাবে আজও এত ব্যস্ততার মধ্যে দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে অবলীলায় সত্যি সেটা আমার জানা ছিল না। সত্যি বলতে কী, কলকাতায় এসে, পুরোনো অনেক কিছু যেমন মিস করি, তেমনই মিস করি পুরোনো সম্পর্কের গ্রন্থির টান। আজকাল পাশাপাশি থেকেও মানুষের মধ্যে এত দূরত্ব আর মীরের সেদিনের আন্তরিক ব্যবহার দেখে তাই মনে হল, কলকাতা শহরটা এত বদলের মধ্যেও কেন এখনও এতটা প্রিয়, এত চেনা। মীরের মতো কেউ বা কজন এখনও রয়ে গেছে বলে। শহরের বুকে এরা শুধুই এগিয়ে চলে, কোনও ঝড়ঝাপটা এদের স্পর্শ করতে পারে না। এরা কোনওদিনও ফুরিয়ে যায় না। শহরের হৃদস্পন্দন এরাই — শহরের আসল পরিচিতিও বটে। এরা দুহাত ভরে শহরকে দিয়ে যায়, বিনিময়ে কী পায়, কতটা পায়, তার হিসেব রাখে না।

পেশাগত দিক থেকে দেখলে মীরকে সুপ্রতিষ্ঠিত, খ্যাতনামা, সফল — এরকম কয়েকটি বিশেষণের মোড়কে মুড়ে ফেলা যেতেই পারে খুব সহজে। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে, মীর যে কতটা উদার এবং সংবেদনশীল, তা প্রতিটি পদক্ষেপে আমি টের পেয়েছি। শুধু ওর সঙ্গে মিশে নয় (কারণ সে সুযোগ আমার তেমন নেই), ওর সঙ্গে যারা সবসময় থাকেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে কথা বলে। আর তাই নিজেকে যখন মীরের গুণমুগ্ধ বলে পরিচয় দিয়েই ফেলেছি, তখন আজ আমার বলতে বাধা নেই যে ওর জীবন থেকে আমি অনেককিছু শিখেছি। লিখতে লিখতে শুধু যে ভাষার চয়ন করেছি, ভাবনার আর ভাবের জাল বুনেছি, তা কিন্তু নয়। প্রতিটি ঘটনার বর্ণনায় রয়েছে আমার শেখবার ও জানার প্রচেষ্টা। এদেশের মেঘলা দিনগুলোতে যেমন এই বইয়ের

BanglaBook.org

পাতা উলটিয়েছি, তেমনই নিবিড় আনন্দে একসঙ্গে অনেক কিছু লিখে গেছি অনায়াসে। কখনও সাবলীল ছন্দে মনের ভাব প্রকাশ করেছি আর বুঝেছি — এভাবেও জয় করা যায়। এভাবেও এগিয়ে চলা যায়। হার না মেনে, মাথা না নুইয়ে। সঠিক পথে, পরিশ্রম করে, নিজের পারা না পারার গণ্ডির মধ্যে থেকেও আকাশ ছোঁওয়া যায়। ইচ্ছে থাকলেই সবটা পারা যায়। সবটাই সম্ভব। স্বপ্নটাও বাস্তব। আবার বাস্তবটাও যে স্বপ্নের মতো রঙিন।

I wish him every success in his life! May all his wishes come true.

❑ ❑ ❑

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মীরের সঙ্গে চটজলদি

১. একজন আর্টিস্টের ট্রু স্পিরিট:

আজকাল শিল্পীর সংজ্ঞাটা পালটে গেছে। কে একজন সত্যিকারের শিল্পী, আর কে নন — সেই নিয়ে একটা বিতর্কের ধোঁয়াশা বর্তমানে লোকের মনেও দানা বেঁধেছে। তবুও আমার মনে হয় একজন স্রষ্টার তার নিজের সৃষ্টি করার আঙ্গিকটা বুঝতেই অনেকটা সময় চলে যায়। নিজেকে ডিসকভার করে নিজের মধ্যে যে শিল্পী সত্তাটা আছে, সেটাকে ঠিক ভাবে বিকাশ করতে করতেই তার অর্ধেক জীবন কেটে যায়। নিজেকে জানার, নিজেকে ঠিক দিকে ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাই হয়তো একজন শিল্পীর ট্রু স্পিরিট।

২. নাটক! স্টেজে অভিনয়:

স্টেজের জন্য যে ডেডিকেশন দরকার সেটার আর সময় পাই না। তাই স্টেজ এখন ব্যাক স্টেজে। সযত্নে সরিয়ে রেখেছি। যেভাবে স্টেজকে আমি এক্সপ্লোর করতে চাই, যেভাবে আমি ওটা নিয়ে কাজ করতে চাই, সেটার জন্য একটা গোটা লাইফ দরকার। যদি সেরকম সময় বের করতে পারি, তাহলে পরের বছর বসে ভাবব কতটা বা কেমন করে এগোব।

৩. মীর এত সময় এত এনার্জি কোথা থেকে পায়:

জানো না? আমার একটা বিশেষ ব্র্যান্ডের আন্ডারওয়্যার আছে। সেটাকে উলটো করে আমি সোমবার, মঙ্গলবার আর বুধবার পরি আর অন্য দিনগুলো সোজা করে। রবিবার জেনারালি আন্ডারওয়্যার পরি না। আন্ডারওয়্যারের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ মোজাও আছে, সেটাকেও আমি উলটে পরে থাকি। সেই ব্র্যান্ডের নামটা কখনও কোথাও আমি কাউকে বলি না। সেই আন্ডারওয়্যার আর মোজা, মানে আমার অন্তর্বাসই আমার অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস। (হেসে) জোকস অ্যাপার্ট, আমি কাজ ব্যাপারটাকে ঠিক কাজের মতো করে ভাবি না। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, কাজটা যদি ইন্টারেস্টিং না হয়, তাহলে বেশিদিন বা ২৪ ঘণ্টা সেটাকে টানা যায় না। আমার জন্য কাজ মানে, নিজেকে নতুন করে

BanglaBook.org

আবিষ্কার করা। কাজ মানে লোকের সঙ্গে কানেক্ট করা। আর হ্যাঁ, একটা রেকট্যাংগুলার সাদা কাগজ, যেটাকে মাসের শেষে ব্যাঙ্কে গিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে আসলে আমার সংসার চলে।

৪. ব্যান্ডেজের খ্যাতি:

২০১৪-র কোকাকোলা ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের ট্রফিটা যখন সারা ইন্ডিয়া ঘুরে ঘুরে কলকাতা এসে পৌঁছেছিল, ব্যান্ডেজ সেই মঞ্চে পারফর্ম করেছিল। একদিকে ট্রফিটা রাখা আর পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের লাইভ পারফরম্যান্স চলছে। এটা একটা বিশাল পাওয়া ব্যান্ডেজের জন্য। এত সেলিব্রিটি, ফিফার বড় বড় হোতারা সবাই সার বেঁধে বসে আর সেখানে আমরা পারফর্ম করছি। আজও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। জানি না কোনওদিন ফিফার কোনও অনুষ্ঠানে আমরা পারফর্ম করার সুযোগ পাব কিনা, বাট দ্যাট ওয়াজ আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স।

৫. ফেভারিট সিনেমা:

ইস্টবেঙ্গলের ছেলে! চিরঞ্জিত অভিনীত এই ছবিটি সবার দেখা উচিত। যাঁরা দেখেননি, তাঁরা দয়া করে দেখুন। তখনই বুঝবেন কেন এটা আমার ফেভারিট ছবি।

৬. ফেভারিট গান:

ম্যায় জ়িন্দেগি কা সাথ নিভাতা চলা গ্যয়া... হার ফিকর কো ধুঁয়ে মে উড়াতা চলা গ্যয়া...

৭. ফেভারিট কুইজিন:

বিরিয়ানি। যতবার আমি বাড়িতে প্রমিস করেছি যে আর খাব না, ততবার প্রমিস ভুলে আবার পৌঁছে গেছি কোনও না কোনও বিরিয়ানি জয়েন্টে। কলকাতা শহরটায় গজিয়ে ওঠা বিরিয়ানির দোকানগুলো আমার কাছে পিলগ্রিমেজ স্পটস। সবথেকে প্রিয় সিরাজ! আমার স্কুলের ঠিক

BanglaBook.org

পাশেই ছিল দোকানটা। এখন অবশ্য পালটে গেছে অনেকটাই। সেই পুরোনো দোকানটাও আর নেই। তবুও আমার অল টাইম ফেভারিট সিরাজের বিরিয়ানি!

৮. বেস্ট ফ্রেন্ড:

নীতীন। যাকে ছাড়া ব্যান্ডেজ বা আমি কেউই হয়তো কমপ্লিট নই। যখন ব্যান্ডেজ হয়নি, আমাদের গানবাজনা তখন অন্য একটা ব্যান্ডের নামে হত। এক্সপ্রেসো ছিল সেই ব্যান্ডের নাম। নীতীন আমার সঙ্গে সেই তখন থেকেই। আমার ড্রাইভিং ফোর্স বললেও হয়তো কম বলা হবে।

আর দ্বিতীয় হল আমার স্কুলের বন্ধু। নাম শুভেন্দু দাস, আমার ক্লাসমেট। সেই রকম বন্ধুত্বটা আজও একরকম থেকে গেছে।

৯. ফেভারিট পাস টাইম:

লোকের পেছনে লাগা। পেছনের মতো ইরেজিস্টেবল্ বডি পার্ট আর কিছু আছে নাকি?

১০. ইনস্পিরেশন:

মি এন্ড মাইসেলফ। আমি এটা খুব মেনে চলি। কেউ আমার সামনে একটা বিশাল নিদর্শন হতে পারেন। তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হতে পারি, ইন্সপায়ারডও হতে পারি। কিন্তু সেটা আপটু আ সার্টেন এক্সটেন্ট। তারপর নিজে নিজেকে অনুপ্রেরণা না দিলে বাকিটা পথ হাঁটা যায় না বোধ হয় আর। আমার প্রথম জীবনে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম শ্রাবন্তী মজুমদার এবং আমিন সাহানিকে দেখে বা শুনে। শ্রাবন্তী মজুমদারকে মিটও করেছি আমি পরবর্তী কালে। আমির সাহানির সঙ্গে ফোনে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। সেটা একটা দারুণ মুহূর্ত। সারাজীবন মনে রাখবার মতো। কিন্তু বাকি যে আমার পথ চলা, সেটা হয়তো সবার জন্য সত্যি। নিজে নিজেকে অনুপ্রেরণা না দিলে এগিয়ে যাওয়াটা বেশ মুশকিল।

BanglaBook.org

১১. লার্নিং ফ্রম লাইফ

কাউকে পোক না করা: আমার মাঝে মাঝে মনে হয় মিরাক্কেলের এডিটর হয়তো বা হাইয়েস্ট পেড হবে গোটা ইন্ডাস্ট্রিতে। কারণ আমি সারাক্ষণ এত লোকের পেছনে লাগি সারা শো জুড়ে, যে ও বেচারি এডিট করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সত্যি বলতে কী, আমি খুব ভালো লিসনার বাট একজন প্যাথেটিক লার্নার। আমি কখনও কোনও শিক্ষা জীবন থেকে নিই না।

১২. প্রথম প্রেম

ফার্স্ট ক্রাশ? দ্যাট গট crushed, (হেসে) ক্লাস ওয়ান-এ একটি মেয়েকে ব্যাপক লাগত। তারপর যা হয়, কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। ইদানীং ফেসবুকের জন্য ভেবেছিলাম, হয়তো আবার যোগাযোগ করতে পারব। বন্ধু-বান্ধবদেরও জিজ্ঞেসও করেছিলাম, তারা জানে কিনা। কিন্তু কেউ বলতে পারেনি। পরে ফেসবুকে খুঁজে পাওয়ার পরে একবার বোধ হয় একটা লাইন আদানপ্রদানও হয়েছিল। ওর প্রোফাইল পিকও নেই। তাই আমি জানিও না এখন সে কেমন দেখতে।

১৩. মেয়ে মুসকান:

লোকে বলে আমি নাকি লোকের মুখে হাসি ফোটাতে পারি। আর সেই সব হাসির মধ্যে আমি মুসকানকে দেখতে পাই, খুঁজে পাই ওকে। ব্যস্ততার মধ্যে ওর সঙ্গে হয়তো দুদিন টানা দেখা হয় না। যখন বেরিয়ে আসি বা যখন ফিরি, তখন ও ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু যখন কথা হয় বা যখন সময় করে ওর সঙ্গে বসে কথা বলি, তখন ওকে দেখে বাবা হিসেবে আমার গর্ব হয়। ক্লাস সেভেন-এ পড়ে ও এখন। কিন্তু কী সুন্দর আর বলিষ্ঠ ওর ভাবনা চিন্তা। গান বাজনার দিকেও খুব ন্যাক। নানা ধরনের গান শোনে। মাঝে মাঝে ওর স্টক দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। আর আরেকটা কথা বলতেই হবে। ওর সঙ্গে আমার সময়ের ক্ল্যাশ। আমাদের দুজনের দিনের পর দিন দেখা না হওয়া এগুলো আমার জন্য খুব একটা ম্যাটার করে না। কারণ যখনই আমি কোথাও শো করতে যাই, লোকজন এসে জিজ্ঞেস

BanglaBook.org

করে, "মীরদা, মুসকান কেমন আছে?" কোথাও একটা ওকে যেন সঙ্গে নিয়ে চলি আমি আমার ছায়াসঙ্গী করে। তবে এটাও বলতে হবে যে, ও আমার কার্যকলাপ সব যে পছন্দ করে তাও না। আমি টিভি শো তে যা বলি বা সব পাগলামি করে থাকি, সেগুলোকে সমর্থনও করে না। কিন্তু আমার সেটা বেশ ভালো লাগে। যে মীরকে বাইরের লোক চেনে, সেই মীর তার নিজের মেয়ের কাছে একটু অজানা অচেনা থাকলে ক্ষতি কী? মুসকান আমার জীবনের সব চেয়ে বড় পাওয়া।

১৪. যদি আরেকটা সুযোগ আসে তাহলে কি হতে চাও?

আবার মীর আফসার আলি হিসেবেই জন্মাতে চাই। এখনও মীর আফসার আলি হিসেবে অনেক কিছু করা বাকি আছে। তাই আবার আমি হয়েই জন্মাতে চাই।

১৫. নিজের কিছু একটা চেঞ্জ করতে পারার সুযোগ পেলে?

আমার হাইট। যখন স্টেজে সুন্দরী মহিলারা বিশালাকার হিলস্ পরে আমার পাশে এসে দাঁড়ান, আমার নিজেকে তখন বড্ড বেশি বেঁটে বলে মনে হয় তাদের পাশে। আরও কয়েক ইঞ্চি লম্বা হতে পারলে বেশ ভালো হত।

১৬. যাকে বা যাদের দেখলে খুব হিংসে হয়...

সেই সমস্ত লোককে দেখে খুব হিংসে হত, যাদের কাছে সময় আছে। মাঝে মাঝে যখন আমি গাড়ি করে কাজে যাই, তখন দেখি কোনও একটা পাড়ার মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে কেউ একজন চা খাচ্ছে মাটির ভাঁড়ে। সত্যি বলছি খুব হিংসে হয় লোকগুলোকে দেখে।

আমার আব্বার জন্মদিন এপ্রিলের ৪ তারিখ। আব্বাকে একবার একটা ঘড়ি কিনে দেব বলে জিজ্ঞেস করেছি, আপনার কোন ঘড়ি পছন্দ? আব্বা আমার দিকে হেসে বলেছিলেন, "আমায় ঘড়ি দিস না, সময় দে। তোর সময়..." সেই কথাটা আজও কানে বাজে।

BanglaBook.org

১৭. যারা পড়লেন এই বইটা তাঁদের জন্য একটা ছোট্ট মেসেজ:

বই পড়ুন, বই পড়া ভালো। আমি অবশ্য আমার ব্যাঙ্ক পাসবুক ছ'ড়া আর কিছুই পড়ি না, তবে আপনারা পড়ুন। যত পড়বেন, তত জানতে পারবেন। আর এই বইটা পড়ার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। আমার জীবনের কয়েকটা শেড শতরূপা খুব সুন্দর করে ন্যারেট করেছে এই বইতে। এটা ঠিক যে, এত বিস্তারিত ভাবে আমি কাউকে কখনও আমার জীবনের কথা বলিনি, যেমন ভাবে শতরূপাকে বলেছি। আজ আমি জীবনের অনেকটা পেরিয়ে এসে রেডিও মির্চির মীর, মীরাক্কেলের মীর হয়ে উঠেছি বলেই এই বইটা লেখা সম্ভব হয়েছে। যদি শুধুই মীর আফসার আলি হয়ে থাকতাম, তাহলে হয়তো কেউ জানতেও পারত না আমার কথা। তাই আশা করব, এই বইটি পড়ে আপনারা সবাই ইন্সপায়ার্ড হবেন।

নিজে পড়ুন এবং পাস ইট অন। নাহ্, পাস অন করবেন না। বইটি কিনে পড়ুন এবং সকলকে কিনতে অনুরোধ করুন। কারণ সত্যি বলতে কী, আমার তো প্রভিডেন্ড ফান্ড বা গ্র্যাচুইটি কিছুই নেই, তাই এই বই-ই সম্বল।

সবশেষে ধন্যবাদ সকলকে আর ধন্যবাদ শতরূপাকে!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org